নেক সূরতে শয়তানের ধোঁকা

১ম খন্ড

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.)

নির্বাচন ও ভাষান্তর
মাওলানা মিজানুর রহমান

নেক সুরতে শয়তানের ধোঁকা

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.)

নির্বাচন ও ভাষান্তর

মাওলানা মিজানুর রহমান
শিক্ষাসচিব, মাদারাসাতুল হুদা
ভালুকা, ময়মনসিংহ

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন

لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين

অর্থঃ তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করোনা, নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

হাসান বিন সালেহ (রহ.) বলেন

إن الشيطان ليفتح للعبد تسعة وتسعين

بابا من الخير يريد به بابا من الشر

অর্থঃ শয়তান মানুষের সামনে কল্যাণের নিরানব্বইটি দরজা উন্মোচন করে, যা দ্বারা তার উদ্দেশ্য হয় অকল্যাণ।

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়ঃ

শয়তান থেকে সতর্কতা অবলম্বনে কোরআনের নির্দেশ

শায়খ আবুল ফরজ বলেন, যখন মানুষ সৃষ্টি করা হয় তখন তাতে সংযোজন করা হয় কামনা, বাসনা ও প্রবৃত্তি; যাতে সে সংগ্রহ করতে পারে যা তার জন্য উপকারী, আর স্থাপন করা হয় তার মাঝে ক্রোধ; যাতে সে প্রতিহত করতে পারে যা তার জন্য ক্ষতিকর। তাকে দান করা হয় আক্বল নামক শিক্ষক, যা তাকে নির্দেশ দেয় সংগ্রহ এবং পরিহারের ক্ষেত্রে ন্যায়নীতি অবলম্বনের। আর সৃষ্টি করা হয় অভিশপ্ত শয়তানকে, যে উৎসাহ দেয় সংগ্রহ এবং পরিহারের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘনের। তাই বুদ্ধিমানের কর্তব্য হলো মানবজাতির চিরশত্রু এ শয়তান থেকে পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করা। মানব সৃষ্টির শুরু থেকে যে তার শত্রুতা প্রকাশ করেছে, বনী আদমের পরিবেশ নষ্টে যে নিজেকে উৎসর্গ করেছে, তদুপরি স্বয়ং রাব্বুল আলামিন নির্দেশ দিয়েছেন তার থেকে সতর্কতা অবলম্বনের। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ১

تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون অর্থঃ তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করোনা, কেননা সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। সে তোমাদের নির্দেশ দেয় মন্দ এবং অশ্লীলতার এবং আল্লাহর ব্যাপারে এমন কথা বলার, যা তোমাদের অজানা।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء অর্থঃ শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্রতার ভয় দেখায় এবং অশ্লীলতার পথ দেখায়।

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا অর্থঃ শয়তান মানুষকে ভ্রষ্টতার অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করতে চায়।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون অর্থঃ শয়তান চায় মদ-জুয়ার ক্ষেত্রে তোমাদের পরস্পরে ঘৃণা ও শত্রুতাভাব সৃষ্টি করতে এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্বরণ ও নামাজ থেকে বিরত রাখতে, সুতরাং তোমরা কী বিরত থাকবে?

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, انه عدو مضل مبين অর্থঃ নিশ্চয় সে প্রকাশ্য শত্রু এবং সুস্পষ্ট গোমরাহকারী।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير অর্থঃ নিশ্চয় শয়তান

তোমাদের শত্রু, সুতরাং তাকে শত্রু হিসেবেই গ্রহণ করো। সে তার দলবলকে এ জন্যই আহ্বান করে যেন তারা জাহান্নামী হয়।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, لا يغرنكم بالله الغرور অর্থঃ কোন প্রতারকের প্রতারণা তোমাদেরকে যেন প্রতারিত না করে।

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين অর্থঃ হে আদম সন্তান, আমি কী তোমাদের থেকে প্রতিশ্রুতি নেইনি যে, তোমরা শয়তানের অনুসরণ করবেনা? নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

কোরআনের পাতায় পাতায় বিদ্যমান রয়েছে এরুপ অগণিত দলীল।

❁❁শায়খ আবুল ফরজ বলেন, মানুষের জেনে রাখা উচিত যে, ইবলিসের কাজ হলো মানুষের মনে সংশয় সৃষ্টি করা। সর্ব প্রথম আদমকে (আ.) সিজদার বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করে সিজদা প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে উপাদান সমূহের মাঝে শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয় করতে গিয়ে বলে, خلقتني من نار وخلقته من طين অর্থঃ হে প্রভু, আদমকে সিজদার নির্দেশ এ কেমন অবিচার, অথচ তার সৃষ্টি-উপাদান মাটি, আর আমার সৃষ্টি-উপাদান আগুন! অতঃপর মহাপ্রজ্ঞাবান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ উপেক্ষা করে বলে, أرأيتك هذا الذي كرمت علي অর্থঃ আচ্ছা বলুনতো, কী কারণে আদমকে আমার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করলেন! অর্থাৎ আপনি যা করেছেন তা প্রজ্ঞাপূর্ন নয়, বরং তা প্রজ্ঞাশূন্য। অতঃপর সে দম্ভকরে ঘোষণা দেয়, أنا خير منه আমি তার থেকে শ্রেষ্ঠ। অনন্তর সে নিবৃত্ত হয় সিজদা করা থেকে, ফলে সম্মান লাভের পরিবর্তে অভিশাপ ও শাস্তি দ্বারা নিজেকে সে লাঞ্ছিত করে।

সুতরাং শয়তান কোন বিষয়ে যখন প্ররোচনা দেয়, তখন মানুষের উচিত তার থেকে পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করা এবং মন্দকাজের নির্দেশ প্রদানকালে তাকে লক্ষ করে বলা, তোমার নসীহত গ্রহণের পরিণামতো প্রবৃত্তির অনুসরণ। আর অন্যের হিতার্থী ঐ ব্যক্তি কিভাবে হতে পারে, যে নিজের হিত কামনায় উদাসীন! আর শত্রুর নসীহতে আস্থাবান হওয়া – এতো নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক।

এভাবে শয়তানের প্ররোচনা এড়িয়ে তাকে বলবে, আমার মাঝে অনুপ্রবেশের সকল ছিদ্রপথ তোমার জন্য বন্ধ।

এবার শুরু হবে নফসের চক্রান্ত, সে উদ্বুদ্ধ করবে প্রবৃত্তির অনুসরণের ব্যাপারে। তখন মানুষের কর্তব্য হলো, গুনাহে লিপ্ত হওয়ার পরিণামফল আক্বল দ্বারা চিন্তা করা; তাহলে আশা করা যায়, গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার দৃঢ় ইচ্ছা আল্লাহর মদদে প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে রক্ষা করবে।

❁❁হাসান বিন সালেহ বলেন, শয়তান মানুষের সামনে কল্যাণের নিরানব্বইটি দরজা উন্মোচন করে, যা দ্বারা তার উদ্দেশ্য হয় অকল্যাণ।

আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেন, নেক সুরতে ধোঁকাদিতে শয়তান বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে। তার কতক পন্থা এমন, যা সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার। কিন্তু প্রবৃত্তির অনুসরণে মানুষ হয়ে যায় কাবু, ফলে শয়তানের ধোঁকা হয় তার কাছে অস্পষ্ট, সে লিপ্ত হয় গুনাহে, বরবাদ করে তার দুনিয়া ও আখেরাত।

এবার শুনুন তার অন্য পন্থার বিবরণ, যা সাধারণ মানুষতো বটেই, বহু আলেমের নিকটেও তা অস্পষ্ট। এখানে শয়তান কর্তৃক নেক সুরতে ধোঁকাদানের কিছু দৃষ্টান্ত আমরা তুলে ধরছি। যাতে উদাসীন ব্যক্তি হুঁশ ফিরে পায়, অনবগত ব্যক্তি অবগতিলাভ করে, আর অচেতন ব্যক্তি ফিরে পায় তার সম্বিত-চেতনা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আবেদদের উপর শয়তানের নেক চক্রান্তের বিবরণ

❁❁ওহাব বিন মুনাব্বিহ (রা.) বলেন, বনী ইসরাঈলের মাঝে এক আবেদ ছিলো। এবাদত বন্দেগীতে তার অবস্থান ছিল সবার শীর্ষে। তার যুগে এক বোন তিন ভাইয়ের একটি পরিবার ছিলো, সে ভিন্ন তাদের অন্য কোন বোন ছিলো না। একবার তারা কোন এক অভিযানে বের হওয়ার ইচ্ছা করলো, কিন্তু বোনকে রেখে যাওয়ার মত আস্থাবান ও নির্ভরযোগ্য কাউকে না পেয়ে তারা চিন্তিত হয়ে পড়লো। অবশেষে তারা বনী ইসরাঈলের উল্লেখিত আবেদের নিকট তাদের বোনকে রেখে যেতে সম্মত হলো, আর আবেদ ছিলো তাদের নিকট বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। তারা আবেদের নিকট গমন করে অভিযান থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত তাদের বোনকে তার নিকট আমানত রাখার আবদার করলে আবেদ তাদের আবদার প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে।

ভাইদের বারংবার অনুরোধে আবেদ তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করে তার গির্জার সম্মুখস্থ এক ঘরে বোনকে রেখে যাবার নির্দেশ দিলে তারা

বোনকে সে ঘরে রেখে তাদের অভিযানে বেরিয়ে পড়ে। সে থেকে দীর্ঘকাল বোন আবেদের সন্নিহিতে অবস্থান করে। প্রথম দিকে আবেদ মেয়েটির জন্য খাবার নিয়ে গির্জা থেকে নেমে গির্জার দুয়ারে খাবার রেখে দরজার পর্দা টেনে দিয়ে গির্জার উপর উঠে মেয়েটিকে খাবার নেয়ার নির্দেশ দিতো। মেয়েটি তখন ঘর থেকে বের হয়ে তার জন্য রেখে যাওয়া খাবার নিয়ে যেতো।

খাবার পৌঁছে দেয়ার এ পদ্ধতি কিছুদিন অবলম্বনের পর শুরু হয় শয়তানের চক্রান্ত। সে ছড়িয়ে দেয় ধোঁকার ধূম্র জাল, উন্মোচন করে চক্রান্তের নেক দুয়ার। আর তা এভাবে, খাবার আনার জন্য গির্জা পর্যন্ত আসা-যাওয়ার বিষয়টি শয়তান আবেদের নিকট বড় করে তোলে। ভীতি প্রদর্শন করে সে আবেদকে বলে, আসা-যাওয়ার মাঝে কারো দৃষ্টি মেয়ের উপর পতিত হলে সে তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়বে। সুতরাং তুমি যদি খাবার নিয়ে তার ঘরের দরজায় রেখে আসো তাহলে তা হবে নেকী বৃদ্ধির কারণ, কল্যাণকর ও মহৎকাজ। ফলে শয়তানের বাতলানো পথ অবলম্বন করে অতিবাহিত হয় আবেদের আরো কিছু দিন। সে মেয়েটির ঘরের দরজায় খাবার রেখে আসতো, কিন্তু পরস্পরে কথোপকথন হতো না।

এবার ধোঁকার কৌশল পরিবর্তন করে শয়তান আবেদকে বলে, তুমি যদি খাবার নিয়ে মেয়েটির ঘরের ভেতর রেখে আসো তাহলে নেকীর পরিমাণ আরো বৃদ্ধি পাবে। প্ররোচনা দানের একপর্যায়ে আবেদ শয়তানের পাতা নেক ফাঁদে পা রাখে। সে খাবার নিয়ে মেয়েটির ঘরের ভেতর রেখে আসতে শুরু করে।

এভাবে কিছুকাল অতিবাহিত হওয়ার পর শয়তান আবেদের দুয়ারে আবার হানা দেয়। সে আবেদকে বলে, তুমি যদি মেয়েটির সাথে কথা বলতে তাহলে তোমার আলোচনায় তার নিঃসঙ্গভাব দূর হয়ে সে অন্ত রঙ্গতা লাভ করতো। কেননা সে নিঃসঙ্গতার নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ

করছে। শয়তানের অবিরাম প্ররোচনায় আবেদ মেয়েটির সাথে কথা বলতে শুরু করে। তবে কথোপকথনের পদ্ধতি ছিলো, আবেদ থাকতো গির্জার উপর, আর মেয়েটি থাকতো ঘরের ভেতর।

এভাবে কিছুদিন কথা বলার পর শয়তান আবার আসে আবেদের কাছে। সে আবেদকে বলে, তুমি যদি গির্জার দুয়ারে বসো, আর মেয়েটি যদি ঘরের দরজায় বসে পরস্পরে কথা বলো তাহলে সে অধিক সৌহার্দ্য অনুভব করবে। শয়তানের অবিরাম প্ররোচনায় আবেদ অবশেষে গির্জার দুয়ারে আর মেয়েটি ঘরের দরজায় বসে পরস্পরে কথোপকথন শুরু করে।

কথা বলার এ পদ্ধতি কিছুদিন অব্যাহত থাকার পর শয়তান পুনরায় হাজির হয় আবেদের দুয়ারে। সে আবেদকে বলে, তুমি যদি গির্জার দরজা থেকে অগ্রসর হয়ে ঘরের দরজার নিকটে কোন জায়গায় বসে তার সাথে কথা বলো তাহলে সে আরো অধিক সৌহার্দ্য অনুভব করবে। তদুপরি এতে রয়েছে প্রচুর নেকি ও মহা প্রতিদান। শয়তানের অবিরাম প্ররোচনায় আবেদ গির্জার দুয়ার থেকে অগ্রসর হয়ে মেয়েটির দরজার নিকট কোন এক জায়গায় বসে মেয়েটির সাথে কথোপকথন শুরু করে।

কথা বলার এ পদ্ধতি কিছুকাল অব্যাহত থাকার পর শয়তান আবার হানা দেয় আবেদের অন্তরে। সে আবেদকে বলে, তুমি যদি মেয়েটির নিকটবর্তী হয়ে তার ঘরের দুয়ারে বসে কথা বলো তাহলে তার সৌহার্দ্যবোধ আরো বৃদ্ধি পাবে, আর তাকে কষ্ট করে ঘরের বাইরে আসতে হবে না। তাছাড়া অন্য পুরুষের কুদৃষ্টি থেকে সে রক্ষা পাবে; আর অন্যকে গুনাহ থেকে বাঁচানোতো মহাপূণ্যের কাজ। শয়তানের এহেন নেক প্রলোভনে আবেদ উপবেশন করে মেয়েটির ঘরের দুয়ারে, আলাপ করে সারাদিনব্যাপী।

কথা বলার এ পদ্ধতি কিছুকাল অব্যাহত থাকার পর আবেদের দুয়ারে শয়তানের পুনরাগমন ঘটে। শয়তান আবেদকে বলে, আর কতকাল

বাইরে থেকে কথা বলবে, এভাবে কথা বললে মানুষ সমালোচনা করবে; তাই ঘরে প্রবেশ করে তার সাথে আলাপ করো। তুমিও সমালোচিত হবে না, মেয়েটিও কুদৃষ্টির শিকার হবে না। শয়তানের নিরন্তর প্ররোচনায় আবেদ অনুপ্রাণিত হয়। সে ঘরে প্রবেশ করে মেয়েটির সাথে আলাপ শুরু করে। তার দিন কাটে মেয়েটির সাথে কথা বলে আর রাত কাটে গির্জায় এবাদত-বন্দেগীতে।

কথা বলার এ পদ্ধতি কিছুকাল অব্যাহত থাকার পর ইবলিস আবার আসে আবেদের কাছে। সে ক্রমান্বয়ে আবেদের জন্য মেয়েটিকে সজ্জিত করে তোলে। ফলে একপর্যায়ে আবেদ মেয়েটির রানে টিপ দিয়ে তাকে চুমু দেয়। শয়তান আবেদের দৃষ্টিতে মেয়েটির রূপ আরো বাড়িয়ে তোলে। ফলে আবেদ প্রলুব্ধ হয়ে মেয়েটির সাথে মিলন ঘটায়। মেয়েটি গর্ভবতী হয়ে একটি ছেলে সন্তান জন্ম দিলে শয়তান আবেদের নিকট পুনোরাগমন করে বলে, মেয়ের ভাইয়েরা অভিযান থেকে ফিরে এসে যদি এ সন্তান দেখতে পায়, তাহলে তোমার কী অবস্থা হবে! তারা কি তোমার অপকর্মের কথা জনসম্মুখে গোপন রাখবে! না না, তারা তোমার অপকর্ম লোকালয়ে ফাঁস করে তোমার বুযূর্গী খতম করে দেবে। সুতরাং তুমি ছেলেটিকে জবেহ্ করো, তাকে মাটির নীচে পুঁতে রাখো, দুনিয়া থেকে তার চিহ্ন বিলুপ্ত করে দাও। তাহলে নিজ অপকর্মে লিপ্ত হওয়ার বিষয়ে ভাইয়েরা অবগত হওয়ার ভয়ে মেয়েটি তোমার বিষয় ভাইদের থেকে গোপন করবে। আবেদ শয়তানের নির্দেশ মোতাবেক শিশুটিকে হত্যা করে মাটির নিচে পুঁতে রাখে।

এবার শয়তান আবেদকে বলে, তুমি কী মনে করো মেয়েটির সাথে তোমার অপকর্ম এবং ছেলে হত্যার বিষয়টি সে তার ভাইদের থেকে গোপন করবে? না না, সে কিছুতেই তা গোপন করবেনা। সুতরাং তাকে ধরো, হত্যা করে ছেলের সাথেই দাফন করো। আর ধরাধাম থেকে নিশ্চিহ্ন করো তোমার অপকর্মের নিশানা।

শয়তানের অবিরাম প্ররোচনায় আবেদ মেয়েটিকে হত্যা করে ছেলেটির সাথে একগর্তে নিক্ষেপ করে। বিশালাকৃতির পাথর দিয়ে সে তাদেরকে ঢেকে দেয়। অতঃপর আবেদ গির্জায় আরোহণ করে আল্লাহর এবাদতে মনোনিবেশ করে।

কিছুদিন পর অভিযান শেষে ফিরে ভাইয়েরা আবেদের কাছে বোনের কথা জিজ্ঞাসা করে। সে তাদেরকে বোনের মৃত্যুসংবাদ জানিয়ে বোনের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলে, সে যুগের সর্বোত্তম মেয়ে ছিলো। তোমরা তাকিয়ে দেখো, এটাই তার কবর। ভাইয়েরা কবরের কাছে গিয়ে বোনের জন্য কান্নাকাটি করে সহানুভূতি প্রকাশ করে। তারা বোনের কবরের নিকট কিছুদিন অবস্থান করে নিজ নিজ পরিবারের কাছে চলে যায়।

যখন রাত অন্ধকার হলো এবং ভাইয়েরা শয্যা গ্রহণ করলো, তখন শয়তান এক মুসাফির ব্যক্তির আকৃতিতে তাদের কাছে গিয়ে প্রথমে বড় ভাইকে তার বোন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো।

বড় ভাই বোনের ব্যাপারে আবেদের বক্তব্য, সহানুভূতি ও তার কবর দেখানোর বিষয়টি শয়তানকে বিদিত করলে শয়তান আবেদের সংবাদকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে বললো, আবেদ তোমাদের বোনের বিষয়ে তোমাদেরকে সত্য সংবাদ দেয়নি। সে তোমার বোনের সাথে অপকর্মে লিপ্ত হয়ে তাকে গর্ভবতী করলে সে একটি বাচ্চা প্রসব করে; অতঃপর সে বাচ্চাসহ তোমার বোনকে হত্যা করে বোনের জন্য আবেদ কর্তৃক নির্ধারিত ঘরের পেছনে একটি গর্ত খনন করে তাতে উভয়কে দাফন করেছে। আর এটাও জেনে রাখো যে, ঘরে প্রবেশের ডান দিকে তার কবরের অবস্থান। সুতরাং তোমরা সেখানে গিয়ে বোনের অবস্থানরত কামরায় প্রবেশ করে আমার বিবরণ মোতাবেক অনুসন্ধান করলে অবশ্যই তাদের সন্ধান পাবে।

এরপর শয়তান মেঝো ও ছোট ভাইয়ের কাছে স্বপ্নে গিয়ে অনুরূপ বক্তব্য পেশ করে।

যখন ভোরের সূর্য উদিত হয় এবং ঘুমের ঘোর কেটে ভাইয়েরা জাগ্রত হয় তখন স্বপ্নে দেখা বিষয়ে আশ্চর্য হয়ে একে অপরকে বলে, আমি আজ এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি। প্রত্যেকে নিজ নিজ স্বপ্ন পেশ করার পর বড় ভাই বললো, এতো নিছক স্বপ্ন, যার কোন বাস্তবতা নেই। সুতরাং এ বিষয়ে আলাপ বাদ দিয়ে তোমরা নিজ নিজ কাজে লেগে যাও।

তখন ছোট ভাই বললো, আল্লাহর শপথ, স্বপ্নে নির্ধারিত স্থান দেখা পর্যন্ত আমি ক্ষান্ত হবোনা।

তারা তখন দলবদ্ধ হয়ে আবেদ কর্তৃক নির্ধারিত বোনের আবাসস্থলে গিয়ে ঘরের দরজা খুলে স্বপ্নে নির্দেশিত স্থানে অনুসন্ধান করে শিশুসহ জবেহকৃত বোনকে গর্তে পাথরচাপা দেয়াবস্থায় দেখতে পেয়ে আবেদকে স্বপ্নে বিবৃত শয়তানের বক্তব্য সত্য কিনা জিজ্ঞাসা করলে আবেদ বোন ও তার সন্তানের সাথে কৃত অপকর্মের বিষয়ে শয়তানের বক্তব্যকে সত্যায়ন করে। ভাইয়েরা তখন শুলে চড়ানোর জন্য আবেদকে গির্জা থেকে টেনে নামায়।

তারা যখন আবেদকে কাঠের সাথে মজবুতভাবে বাঁধে তখন শয়তান আবেদের কাছে হাজির হয়ে আবেদকে বলে, আমি তোমার সেই সাথী যে তোমার মনকে মেয়েটির প্রতি আকৃষ্ট করেছে। ফলে একপর্যায়ে তুমি তাকে গর্ভবতী করেছো এবং শিশুসহ মেয়েটিকে হত্যা করেছো। সুতরাং আজ যদি তুমি আমার অনুসরণ করো এবং তোমার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে অস্বীকার করে কাফের হয়ে যাও তাহলে এ মহাবিপদ থেকে আমি তোমাকে উদ্ধার করবো। তখন শয়তানের কথামতো আবেদ আল্লাহকে অস্বীকার করে। যখন সে আল্লাহকে অস্বীকার করে তখন শয়তান সেখান থেকে চলে যায়, আর ভাইয়েরা আবেদকে শুলে চড়িয়ে না ফেরার দেশে পাঠিয়ে দেয়।

মুবারক বিন ফুযালা হাসানের (রহ.) সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, কিছু লোক একটি গাছের পূজা করতো। তখন এক আবেদ গাছটির নিকট এসে বললো, আমি অবশ্যই এ গাছটি কেটে ফেলবো। তখন সে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে ক্ষুব্ধ হয়ে গাছটি কাটতে উদ্যত হলে মানবাকৃতিতে শয়তান তার সামনে উপস্থিত হয়ে বললো, তুমি কী করতে চাও? আবেদ বললো, আমি মানুষের পূজিত এ গাছটি কাটতে চাই। শয়তান বললো, তুমি যেহেতু গাছটির পূজা করোনা সেহেতু মানুষের পূজায় তোমার কী ক্ষতি? আবদে বললো, আমি তোমার কোন কথাই শুনতে চাই না, গাছটি আমি কাটবোই। শয়তান বললো, গাছ কাটার কোন সুযোগ আমি তোমায় দিব না। আবেদ বললো, আমি তা কাটবোই। এভাবে আবেদ, শয়তান যুদ্ধে লিপ্ত হলে আবেদ শয়তানকে ধরাশায়ী করে। শয়তান উপায়ান্তর না দেখে আবেদকে বলে, তুমি যদি গাছটি কাটা হতে বিরত থাকো তাহলে প্রতিদিন সকালে তোমার বালিঁশের নিচে দু'টি দীনার বিদ্যমান পাবে, যা দ্বারা নিজ প্রয়োজন মিটিয়ে গরীব-দুঃখীদের সহযোগিতা করতে পারবে। আর গাছ কেটে কী লাভ? আজ একটি কাটবে, কাল লোকেরা দশটি লাগিয়ে সেগুলোর পূজা করবে। শয়তানের কথা আবেদের মনঃপূত হলে আবেদ শয়তানকে জিজ্ঞেস করে, দীনার আমার নিকট কোথা হইতে আসবে? শয়তান বললো, আমি নিজেই তার জিম্মাদার। আবেদ তথা হইতে প্রস্থান করে বাড়ীতে সকাল যাপন করলে শয়তানের ওয়াদা মোতাবেক বালিশের নিকট সে দু'টি দীনার বিদ্যমান পায়। অতঃপর দ্বিতীয় দিন আবেদ সকাল যাপন করে বালিশের নিকট কোন দীনার না পেয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে গাছটি কাটার জন্য উদ্যত হলে শয়তান পূর্বের ন্যায় মানবাকৃতিতে আবেদের সামনে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করে, তুমি কী করতে চাও? আবেদ বললো, আল্লাহকে ব্যতীত লোকেরা যে গাছটির পূজা করছে আমি তা কাটতে

চাই। শয়তান বললো, গাছটি কাটার কোন সুযোগ আমি তোমাকে দিবো না। আবেদ গাছটি কাটতে উদ্যত হলে শয়তান প্রহার করে আবেদকে ধরাশায়ী করে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়ে বলে, জানিস আমি কে? আমি হলাম অভিশপ্ত শয়তান। প্রথমবার তোর বুকে স্ফীত ক্রোধ আল্লাহর জন্য হওয়ায় তোর উপর আমার কোন কর্তৃত্ব ছিলোনা বিধায় দু'দীনার দ্বারা আমি তোকে ধোঁকা দিয়েছি, ফলে তুই গাছ কাটা বর্জন করে বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করেছিস। কিন্তু দ্বিতীয়বার তোর ক্রোধের একমাত্র উৎস যেহেতু দীনার হারানোর বেদনা, তাই প্রভাব বিস্তারের সকল গায়েবী বাধা তোর উপর থেকে সরে গেছে এবং তোকে ধরাশায়ী করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে।

এবাদতের ক্ষেত্রে আবেদদের উপর শয়তানের নেক চক্রান্তের বিবরণ

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, শয়তান মানুষের হৃদয়রাজ্যে প্রবেশের প্রধান ফটক হচ্ছে, ধর্মীয় বিধি-বিধান সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা। তাই ধর্মীয় বিধি-বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তির হৃদয়ে শয়তান নিরাপদেই প্রবেশ করে। পক্ষান্তরে ধর্মীয় বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞাত ব্যক্তির হৃদয়ে শয়তান অতি গোপনে প্রবেশ করে।

ধর্মীয় বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞান সল্পতার কারণেই শয়তান বহু আবেদকে নেক সুরতে ধোঁকা দিয়েছে। ফলে তাদের অধিকাংশরা এবাদত নিয়েই ব্যস্ত ছিলো। তারা না ইলমের গভীরে প্রবেশ করেছে না প্রবেশ করার প্রয়োজন অনুভব করেছে। এ কারণেই রাবী বিন হাইছাম বলেন, تفقه ثم اعتزل আগে ফিক্হ শাস্ত্র অধ্যয়ন করো তারপর নির্জনে এবাদত করো।

শয়তান আবেদদেরকে নেক সুরতে ধোঁকা দেয়ার প্রধান কারণ, তারা নফল এবাদতকে ইলমের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে, অথচ ইলম নফল এবাদত হতে উত্তম। আর শয়তান আবেদদেরকে ধারণা দেয় যে, ইলমের উদ্দেশ্য তো আমল, সুতরাং যে আমল করে তার জন্য ইলম অন্বেষণের প্রয়োজন নেই। আর তারা আমল দ্বারা দৈহিক আমলকেই বুঝে। তাদের জানা নেই যে, প্রকৃত আমল হচ্ছে অন্তরের আমল, কেননা অন্তরের আমল দৈহিক আমল হতে শ্রেষ্ঠ।

মুতাররিফ বিন আবদুল্লাহ বলেন, فضل العلم خير من فضل العبادة ইলমের মর্যাদা এবাদতের মর্যাদা হতে উত্তম।

ইউছুফ বিন আছবাত বলেন, باب من العلم تتعلمه خير من سبعين غزاة ইলমের একটি অধ্যায় শিক্ষাকরা সত্তরটি জিহাদ হতে উত্তম।

মুআফি বিন ইমরান বলেন, كتابة حديث واحد أحب الي من صلاة ليلة একটি হাদীস লিখা, আমার নিকট সারারাত নফল নামাজ হতে প্রিয়। আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, আবেদরা শয়তানের পাতানো ফাঁদে পা রেখে যখন ইলমের উপর দৈহিক এবাদতকে প্রাধান্য দিলো, তখন এবাদতের ধরন-পদ্ধতিতে নেক সুরতে ধোঁকা দেয়া শয়তানের জন্য সহজ হলো।

◈নাপাকি হতে পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রে আবেদদের উপর শয়তানের নেক চক্রান্তের বিবরণ।

◊আবেদদের কতক এমন রয়েছেন, যারা পবিত্রতা অর্জনের নিমিত্তে দীর্ঘ সময় টয়লেটে অবস্থান করেন, আর শয়তানও বিষয়টি তাদের

নিকট উত্তম করে তোলে। অথচ টয়লেটে অবস্থান জরুরত পরিমাণে হওয়াই উচিত, কেননা দীর্ঘ সময় টয়লেটে অবস্থান কলিজার জন্য ক্ষতিকর।

আবেদদের কতক এমনও আছেন, যারা এস্তেঞ্জার পর হাঁটাহাঁটি, কাশাকাশি এবং পা-দ্বয় উঠানামা করেন। তাদের ধারণা, তারা এসব পদ্ধতি অবলম্বন করে নাপাকি হতে পবিত্রতা অর্জন করছেন। আর এসব পদ্ধতি অবলম্বন যখনই বৃদ্ধি পায় তখনই প্রস্রাব নেমে আসে। যারা এসব পদ্ধতি অবলম্বন করেন তাদের ভালোভাবে জেনে রাখা উচিত যে, পানি অল্প অল্প করে মূত্রথলিতে জমা হয়। ফলে মানুষ যখন প্রস্রাবের জন্য প্রস্তুত হয় তখন জমে থাকা পানিগুলো মূত্রনালী দিয়ে বেরিয়ে আসে। আর যখন সে হাঁটাহাঁটি ও কাশাকাশি করে তখন নতুন পানি চুইয়ে পড়ে, জমে থাকা পানি নয়। ফলে এসব পদ্ধতি অবলম্বন যত দীর্ঘই হোক না কেন, চুইয়ে পড়া অব্যাহতই থাকবে। তাই মুত্রণালীর প্রস্রাব নিঃসারণের জন্য (কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে) দু'আঙ্গুলের মাঝে পুরুষাঙ্গ দোহন করে পানি ব্যবহার করাই যথেষ্ট।

◇◇আবেদদের কতক এমনও আছেন, মলত্যাগের পর শয়তান যাদের নিকট অধিক পরিমাণে পানি ব্যবহারের বিষয়টি উত্তম করে তোলে। অথচ চরমপন্থী মাযহাবের মতানুসারেও নাপাকির দেহ দুর হওয়ার পর নাপাকযুক্ত স্থান সাতবার ধৌত করাই যথেষ্ট। আর যদি কেউ পাথর ব্যবহার করে, আর নাপাকি মলদ্বার অতিক্রম না করে, তাহলে তিন পাথর দ্বারা নাপাকি দূর হলে তিনটি পাথর ব্যবহার করাই যথেষ্ট। আর শরীয়ত নির্ধারিত রীতিনীতি যার মনঃপূত নয় সেতো বিদআতী, সুন্নতের অনুসারী নয়।

◈আবেদদের অজুতে শয়তানের ধোঁকাদানের বিবরণ

◊◊ আবেদদের কতক এমনও আছেন যারা নিয়্যাতের ব্যাপারে ধোঁকাগ্রস্ত হন। ফলে তারা ওজুকালীন সময়ে একবার বলেন, আমি নাপাকি দূর করছি, অঃতপর বলেন আমি নামাজের উপযুক্ত হচ্ছি, পুনরায় বলেন আমি নাপাকি দূর করছি। এসবের একমাত্র কারণ, শরীয়ত সম্পর্কে অজ্ঞতা। তাদের জেনে রাখা উচিত যে, নিয়্যাতের স্থান হৃদয় – জবান নয়। সুতরাং জবানে উচ্চারণ একটি অনাবশ্যক বিষয়। আর নিয়্যাত যদি কেউ জবানে উচ্চারণ করে তবে একবার উচ্চারণই যথেষ্ট, বারবার উচ্চারণ নিরর্থক-অনাবশ্যক।

◊◊তাদের কতকের অবস্থা এমন, যারা অজুর পানি নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ে যান। তারা হতাশ হয়ে বলেন, এ পানি পবিত্র হওয়ার কি নিশ্চয়তা আছে! হতে পারে এতে নাপাকির সংমিশ্রণ ঘটেছে। এরকম বহু অবাস্তব সম্ভাবনা তাদের মনে ঘুরপাক খায়। তাদের জেনে রাখা উচিত, যে পানি নাপাকির আলামত হতে মুক্ত তা পবিত্র হিসাবেই গণ্য হবে, আর এটাই শরীয়তের মূলনীতি। সুতরাং সম্ভাবনার ভিত্তিতে এ মূলনীতি বর্জন করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

◊তাদের কতক এমনও আছেন, যারা ওজুতে প্রচুর পানি ব্যবহার করেন। আর শয়তান তাদের নিকট এ বিষয়টি উত্তম করে তোলে। তাদের জেনে রাখা উচিত, প্রয়োজনাধিক পানি ব্যবহার চারটি মাকরুহকে অন্তর্ভুক্ত করে। (১) পানির অপচয় (২) এমন বিষয়ে জীবনের মূল্যবান সময় ব্যয়, যা ওয়াজিব কিংবা মুস্তাহাব নয়। (৩) শরীয়ত অল্প পানি ব্যবহারে তুষ্ট হওয়া সত্ত্বেও বেশী পানি ব্যবহার করে শরীয়তের প্রতি অতুষ্টি প্রকাশ করা (৪) -ক- অঙ্গসমূহ তিনের অধিক ধৌতকরন নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তা অমান্য করে গর্হিত কাজে লিপ্ত হওয়া।

-খ- অনেক সময় বেশী পানি ব্যবহারে ওজু দীর্ঘ হওয়ার দরুন নামাজের ওয়াক্ত কিংবা নামাজের উত্তম ওয়াক্ত চলে যায় অথবা জামাআ'ত শেষ হয়ে যায়।

ওজুতে মাত্রাতিরিক্ত পানি ব্যবহার শরীয়তে নিন্দিত হওয়ার বিষয়ে হাদীস ও আসার থেকে কিছু দলীল পেশ করছি।

◇◇ আমর বিন আস তার পিতা থেকে দাদার সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه الوضوء ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم [رواه النسائي] অর্থঃ এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে ওজু শিখার আবদার জানালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সামনে প্রতিটি অঙ্গ তিন তিনবার ধৌত করে বললেন, ওজু এভাবে করতে হয়। যদি কেউ এর চে' বেশী ধৌত করে, তাহলে সে মন্দ, সীমালঙ্ঘন ও অন্যায় করলো। (নাসাঈঃ অজু অধ্যায়)

◇আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রা.) বলেন, হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাসের ওজুকালীন সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে অতিক্রমকালে বললেন, ما هذا السرف يا سعد قال أفي الوضوء سرف؟ قال: نعم وإن كنت على نهر جار অর্থঃ হে সা'দ, কেন এ অপচয়? হযরত সা'দ বললেন, অপচয় কী ওজুতেও!

তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হাঁ; যদিও তুমি প্রবহমান নদীতে ওজু করো।

◊হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان فاتقوا وسواس الماء অর্থঃ নিশ্চয় ওজুতে এক শয়তান নিযুক্ত রয়েছে যার নাম ওলাহান। সুতরাং পানির বিষয়ে তোমরা তার কুমন্ত্রণা এড়িয়ে চলো।

"ওলাহান" অর্থ, হতভম্ব হওয়া। ওজুর শয়তানকে ওলাহান এজন্য বলা হয়, কেননা সে পানির বিষয়ে ওজুকারীকে হতভম্ব করে। ফলে সে ওজুর পূর্ণতা, অপূর্ণতার বিষয়ে সন্দিহান হয়ে পড়ে।

◊আবু নুআমাহ বলেন, আবদুল্লাহ বিন মুগাফ্ফাল তার ছেলেকে দুআ'য় "হে আল্লাহ আমি আপনার নিকট জান্নাতুল ফেরদাউস এবং আপনাকে চাই" বলতে শুনে বললেন, তুমি আল্লাহর নিকট জান্নাত চাও এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করো, কেননা আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء والطهور অর্থঃ অচিরেই এ উম্মতের কিছু লোক দোয়া এবং পবিত্রতার বিষয়ে সীমালঙ্ঘন করবে।

◊আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেন, আসওয়াদ বিন সালেম একজন উঁচু মাপের বুজুর্গ ছিলেন। প্রথম দিকে তিনি ওজুতে প্রচুর পানি ব্যবহার করা সত্ত্বেও পরে তা বর্জন করলে কেউ তাকে বর্জনের কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে বলেন, আমি এক রাতে ঘুমন্ত হলে গায়েব থেকে হঠাৎ কেউ আওয়াজ দিয়ে বললো, হে আসওয়াদ, কেন এ অপচয়!

আজানের ক্ষেত্রে শয়তানের ধোঁকাদানের বিবরণ।

◇◇ শয়তান আবেদদেরকে আযানে সুর সংযোজনের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে। অথচ ইমাম মালিকসহ বহু ওলামায়ে কেরাম তার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। কেননা সুর সংযোজিত আযান গানের সাদৃশ্যতা লাভ করে, ফলে আযানের মর্যাদা ও গাম্ভীর্যতা ক্ষুণ্ন হয়।

◇তাদের কতক এমনও আছেন, যারা আযানের আগে পরে যিকির, তাসবীহ-তাহলীল এবং ওয়াজ নসীহত করে থাকেন, ফলে আযানের সাথে এসবের সংমিশ্রণ ঘটে, অথচ অভিজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম আযানের সাথে কোন কিছু সম্পৃক্ত করাকে মাকরুহ বলেছেন।

◇ তাদের কতকের অবস্থা এমন, যারা অধিকাংশ সময় রাতের গভীরে মসজিদের মিনারে আরোহণ করে কিংবা মসজিদের মাইকযোগে ওয়াজ নসীহত যিকির আযকার কিংবা উচ্চস্বরে কোরআন তেলাওয়াত করে থাকেন। ফলে ঘুমন্ত ব্যক্তির ঘুম উড়ে যায়, নামাজরত ব্যক্তির খুশুখুযু নষ্ট হয় এবং তেলাওয়াতকারী বিভ্রান্তির শিকার হয়। হায় তারা যদি জানতো, যা তারা করছে তা শরীয়তের দৃষ্টিতে বড়ই নিকৃষ্ট।

নামাজের ক্ষেত্রে শয়তানের ধোঁকাদানের বিবরণ।

শয়তান আবেদদেরকে পরিধেয় কাপরের ব্যাপারে সন্দিহান করে তোলে। ফলে তাদের কতককে দেখা যায়, তারা পবিত্র কাপড়কে একাধিকবার ধৌত করেন। আবার কখনো যদি কোন মুসলমান তার কাপড় স্পর্শ করে তাহলে তা ধৌত করাকে অপরিহার্য মনে করেন। তাদের কতক এমনও আছেন, যারা নিজেদের কাপড় নদীতে ধৌত করেন, বাড়ীতে ধৌত করাকে পবিত্রতার জন্য যথেষ্ট মনে করেন না। আবার কেউ কেউ ইহুদীদের মত কুপের পানিতে কাপড় ঝুলিয়ে

রাখেন। অথচ নবীর প্রিয় ছাহাবারা এর কোনটাই করেন নি। তারাতো পারস্য বিজয়ের পর পারস্যের কাপড় পরিধান করেছেন, তাদের ব্যবহৃত বস্ত্রসমূহ ব্যবহার করেছেন। এসব আবেদদের কারো অবস্থাতো এমন, যদি উপর থেকে তাদের উপর কোন পানির ফোঁটা পড়ে, তাহলে পুরো কাপড় ধৌত করাকে তারা অপরিহার্য মনে করেন। আবার কাউকে দেখা যায় যে, পানির ছিটা গায়ে পড়ার ভয়ে সামান্য বৃষ্টি হলেই তারা জামাতে শরীক হোন না।

কারো মনে এ ধারণা আসার কোনই সুযোগ নাই যে, আমরা পরিচ্ছন্নতা ও খোদাভীতি হতে বারণ করছি, বরং সেই সীমালঙ্ঘন ও সময় অপচয় থেকে নিষেধ করছি যা শরীয়ত বহির্ভূত।

শয়তান তাদের কতককে নামাজের নিয়্যাতের ব্যাপারে ধোঁকা দেয়। ফলে সে তাকবীরের পূর্বে বলে, আমি ওমুক নামাজ পড়ছি, অতঃপর নিয়্যাত ভেঙ্গে গিয়েছে মনে করে পুনরায় বলে, আমি ওমুক নামাজ পড়ছি। তাদের জেনে রাখা উচিত যে, নিয়্যাত কখনো ভাঙ্গে না। অন্তর হচ্ছে নিয়্যাতের স্থান, সুতরাং ফরয নামাজের জন্য কারো দন্ডায়মান হওয়া এটাই নিয়্যাতের জন্য যথেষ্ট। "আমি ওমুক নামাজ পড়ছি" মুখে এ কথার উচ্চারণ একেবারেই নিষ্প্রয়োজন। যদি কেউ মুখে উচ্চারণ করে তবেতো একবার উচ্চারণই যথেষ্ট।

'নিয়্যাত ভেঙ্গে গিয়েছে' এরূপ ধারণার ভিত্তিতে বারবার উচ্চারণ ইবলিস কর্তৃক এমন কুমন্ত্রণা, ইসলামে যার সমর্থন অবিদ্যমান।

তাদের কাউকে দেখা যায়, তাকবীরের পর হাত বেঁধে তা ছেড়ে দেয়, পুনরায় তাকবীর বলে হাত বেঁধে তা ছেড়ে দেয়, এরূপ করতে করতে ইমাম যখন রুকুতে যায়, তখন ওসওয়াসার এ রুগিও ইমামের সাথে রুকুতে শরীক হয়। হায় আপসোস; এতক্ষণ নিয়্যাত উপস্থিত হয়নি মনে করে বার বার সে হাত বেঁধেছে আর হাত ছেড়েছে, এখন

কোন জিনিস তার নিয়্যাতকে উপস্থিত করলো! এসবের একমাত্র কারণ, তেলাওয়াতের ফযীলত থেকে শয়তান তাকে বঞ্চিত করতে চেয়েছে, আর সেও শয়তানের কুমন্ত্রণায় এসব কাজে লিপ্ত হয়েছে। তাদের জেনে রাখা উচিত যে, শরীয়ত সহজ এবং উদার, এসব আপদ বিপদের স্থান শরীয়তে নেই। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাহাবাদের কারো থেকে এসব আচরণ প্রকাশ পায়নি। আবু হজমের ঘটনাতো এমন, তিনি একবার মসজিদে প্রবেশ করলে শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিয়ে বললো, আরে তুমিতো অজু ছাড়া নামাজ পড়ছো, তখন আবু হজম (রহ.) বললো, তোমার উপদেশ না আমার কান শ্রবণ করবে না দীল গ্রহণ করবে।

আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেন, এক লোক ইবনে আক্বীলের সাক্ষাতে এসে বললো, আমার অবস্থাতো এমন, ওজুতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধোয়া সত্ত্বেও আমার মনে হয় আমি তা ধৌত করিনি, নামাজে তাকবীর বলা সত্ত্বেও মনে হয় আমি তা বলি নি। তখন ইবনে আক্বীল তাকে বললেন, তুমি নামাজ পড়া বন্ধ করো, কেননা নামাজ তোমার উপর ফরজ নয়। তখন লোকেরা তাকে বললো, আপনি তাকে একথা কিভাবে বলছেন? তখন ইবনে আক্বীল তাদের বললেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "رفع القلم عن المجنون حتى يفيق" জ্ঞান ফিরে পাওয়া পর্যন্ত পাগল থেকে সকল বিধান রহিত করা হলো। আর তাকবীর বলা সত্ত্বেও যে বলে আমি তাকবীর বলিনি, সেতো বোধশক্তিহীন-পাগল, আর পাগলের উপর নামাজ ফরজ নয়।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, মানুষ আক্বলের ভারসাম্যহীনতা এবং শরীয়ত সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেই নামাজের নিয়্যাতের ব্যাপারে

ওসওয়াসাগ্রস্ত হয়। একটি উপমা দ্বারা বিষয়টি সহজেই বুঝে আসে। যদি কারো বাড়িতে কোন বড় আলেমের আগমন ঘটে তাহলে সে ব্যক্তি আলেমের সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যায়, আর দাঁড়ানোর পুর্বে সে মনে মনে বলে, ইনি একজন বড় আলেম, সুতরাং তার সম্মানার্থে দাঁড়ানো উচিত। আর আলেমকে দেখামাত্র তার সম্মানার্থে দাঁড়ানোর বিষয়টি মনে উদয় হওয়ার নামই নিয়্যাত। তদ্রুপ ফরয পালনার্থে নামাজের জন্য দন্ডায়মান হওয়া এমন একটি বিষয়, যার কল্পনা সে এক মুহূর্তেই করতে পারে, তাতে সময় দীর্ঘ হয়না; বরং সময়তো দীর্ঘ হয় কল্পনার বিষয়টি উচ্চারণের ক্ষেত্রে, আর নিয়্যাত মুখে উচ্চারণ কোন আবশ্যক বিষয় নয়, বরং তা হচ্ছে একটি ওসওয়াসা, মূর্খতাই যার উৎপত্তিস্থল। আর ওসওয়াসাগ্রস্ত লোক মনের বিষয় মুখে উচ্চারণের দ্বারা নিজেকে অনর্থক কষ্টের সম্মুখীন করে। অথচ আলেমের সম্মানার্থে দাঁড়ানোর সময় এই ব্যক্তিও লজ্জার দরুন এমনটি করতে অক্ষম হবে। এই উদাহরণ যার বুঝে এসেছে আশা করি নিয়্যাতের বিষয় তার নিকট পরিষ্কার হয়েছে।

আর নিয়্যাত তাকবীরের পূর্বে করাও জায়েজ। সুতরাং নিয়্যাতকে তাকবীরের সাথে মিলিয়ে নিজেকে কষ্টের সম্মুখীন করার কী প্রয়োজন! যেহেতু কষ্ট ছাড়াই তা অর্জিত হয়।

ওসওয়াসাগ্রস্তদের কতক এমনও আছেন, যারা বিশুদ্ধভাবে নিয়্যাতের পর তাকবীর বলেন, কিন্তু নামাজের বাকি বিষয়ে উদাসিনতা প্রদর্শন করেন। অথচ তাকবীর হচ্ছে দরজার ন্যায়, যা দ্বারা নামাজ নামক গৃহে প্রবেশ করা হয়। সুতরাং দরজার প্রতি যত্নবান হয়ে ঘরের যত্ন ছেড়ে দেয়া কী বুদ্ধিমানের কাজ?

আবেদদের কতক এমনও আছেন, যারা শয়তানের নেক ধোঁকায় বহু সুন্নাত ছেড়ে দেন। তাদের কারো অবস্থাতো এমন, যারা নামাজে

প্রথম কাতারে দাঁড়ান না। তারা বলেন, পিছনের কাতারে দাঁড়ানো একাগ্রতার জন্য বেশী সহায়ক, তাই প্রথম কাতারে না দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় কাতারে দাঁড়ানোই আমার জন্য উত্তম। তাদের কতক এমনও আছেন, যারা নামাজে হাত বাঁধেন না। তারা বলেন, নামাজের প্রতি এমন একাগ্রতার বহিঃপ্রকাশ আমার নিকট অপসন্দনীয় যা আমার অন্তরে নেই। আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, কতক প্রসিদ্ধ বুজুর্গ থেকেও এরূপ আমল প্রকাশ পেয়েছে। এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, ইলমের স্বল্পতাই তাদেরকে এরূপ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রহ.) তাদের বিশুদ্ধ গ্রন্থ বুখারী ও মুসলিম শরীফে আবু হুরাইরার (রা.) সূত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস নকল করেন, যা সুস্পষ্টভাবে তাদের আমলকে সুন্নাত পরিপন্থী সাব্যস্ত করে, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما لهم في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا অর্থঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যদি মানুষ আজান ও প্রথম কাতারের ফযিলত জানতো, তাহলে লটারির মাধ্যমে হলেও তা লাভের প্রাণান্তর চেষ্টা চালাতো।

মুসলিম শরীফের অন্য রেওয়ায়েতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها অর্থঃ প্রথম কাতার পুরুষের জন্য শ্রেষ্ঠতর আর শেষ কাতার তাদের জন্য নিকৃষ্টতর।

আর নামাজে হাত বাঁধা সুন্নাত হওয়ার বিষয়টিও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। ইমাম আবু দাউদ (রহ.) তার সুনান গ্রন্থ আবু দাউদ

শরীফে ইবনে যোবায়েরের বক্তব্য নকল করে বলেন, وضع اليد على اليد سنة অর্থাৎ নামাজে হাতের উপর হাত রাখা সুন্নাত। অন্য বর্ণনায় এসেছে, إن ابن مسعود كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى অর্থাৎ ইবনে মাসউদ (রা.) নামাজে ডান হাতের উপর বাম হাত রাখতেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিষয়টি লক্ষ করে তার বাম হাতের উপর ডান হাত রেখে ভুল শুধরে দিলেন।

প্রিয় পাঠক, প্রসিদ্ধ বুযুর্গদের উল্লিখিত আমলের প্রতি আমাদের নিন্দা যেন আপনাকে বিস্মিত না করে। কেননা প্রকৃত নিন্দাকারীতো আমরা নই, বরং শরীয়তের দলীল-প্রমাণই তাদের আমলের অসারতা প্রমাণ করে, আমরা শুধু আপনার নিকট তা পৌঁছে দেয়ার খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছি।

কোন একজন ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে (রহ.) বললো, ইবনুল মুবারকতো এমন এমন বলেন। তিনি তখন বললেন, ইবনুল মুবারতো আসমান থেকে নেমে আসেন নি। তাকে বলা হলো, ইবরাহিম বিন আদহামও এইরূপ বলেন। তিনি বললেন, তোমরা এ বিষয়ে শরীয়তের দলীল পেশ করো, কেননা শরীয়তের অনুসরণই তোমাদের উপর কর্তব্য, তাই নিজ হৃদয়ে বড়ত্বের আসন গ্রহণকারী কোন ব্যক্তির কথায় শরীয়তের অনুসরণ ছাড়া যাবেনা। কেননা শরীয়ত সবচে' বড়, সকলেই শরীয়তের অনুসারী, শরীয়ত কারো অনুসারী নয়। আর এটাও সম্ভব যে, এ সংক্রান্ত হাদীস তার নিকট পৌঁছে নি।

শয়তান বহু নামাজীকে হরফের মাখরাজের ব্যাপারে ধোকাগ্রস্ত করে। ফলে তারা বলে, 'আল হামদু, আল হামদু' এভাবে বারবার

উচ্চারণের দরুন তারা নামাজের আদাবী কানুন থেকে বেড়িয়ে আসে। আবার কখনো তাশদীদ উচ্চারণের ক্ষেত্রে ধোঁকাগ্রস্ত করে, আর কখনো 'আল মাগদুবী আলাইহিম' এর ض উচ্চারণের ক্ষেত্রে ধোঁকাগ্রস্ত করে। আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেন, আমি এমন ব্যক্তিকে দেখেছি, যে 'আল মাগদুবী আলাইহিম' উচ্চারণ করছে আর ض উচ্চারণে চাপ প্রয়োগের দরুন তার থুথু বের হচ্ছে। এসব লোকদের জেনে রাখা উচিত যে, উচ্চারণের ক্ষেত্রে এরূপ চাপ প্রয়োগ শরীয়তের নীতি বহির্ভূত। বরং মাখরাজ থেকে প্রতিটি হরফকে সাবলীলভাবে উচ্চারণ করাই নামাজ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

শয়তান এসব লোকদেরকে উচ্চারণের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ির দরুন শুদ্ধতার সীমা অতিক্রম করায়, আর উচ্চারণের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জনের দরুন তাদেরকে তেলাওয়াত বুঝা হতে বঞ্চিত করে। কোরআন সুন্নাহর জ্ঞান যার রয়েছে সে পরিষ্কার ভাবেই বুঝবে যে, শয়তান কর্তৃক ওসওয়াসার দরুনই তারা এরূপ করে থাকে। দলীল স্বরূপ আনাস বিন মালেকের হাদীস আমরা এখানে পেশ করছি।

সাঈদ বিন আবদুর রহমান বিন আবীল আমইয়া বলেন, সাহল বিন আবু উমামা আমাকে বলেছেন, আমি ও আমার পিতা কোন একবার সাহাবী আনাসের (রা.) দরবারে উপস্থিত হই, তিনি তখন এত সংক্ষিপ্ত নামাজ পড়ছিলেন যে, মনে হলো তা মুসাফিরের নামাজ। তিনি সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করলে আমরা বললাম, আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন; যে নামাজ পড়তে আমরা আপনাকে দেখেছি, তা কি ফরজ নামাজ না নফল নামাজ? যদি ফরজ হয়ে থাকে, তাহলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম কী এভাবেই নামাজ পড়েছেন? তিনি বললেন, তা ফরজ নামাজ এবং

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামও এভাবেই নামাজ পড়েছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায়ই বলতেন, لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم. فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. "ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم"
অর্থঃ তোমরা এবাদত-বন্দেগীতে নিজেদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করোনা, তাহলে হতে পারে অচিরেই তোমাদের প্রতি কঠোরতা চাপিয়ে দেয়া হবে। ইতঃপূর্বে এক সম্প্রদায় নিজেদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করেছিলো, ফলে আল্লাহ তাদের উপর কঠোরতা চাপিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তাদের সম্পর্কে বলেছেন, তারা এমন সন্যাসধর্ম আবিস্কার করেছে যা আমি তাদের উপর ফরয করিনি।

ইবলিসের নেক সুরতে ধোঁকার ফলে বহু মূর্খ আবেদ লম্বা লম্বা নামাজ পড়ে এবং বেশী পরিমাণে কেরাত পড়ে, কোন সন্দেহ নেই যে এটা অত্যন্ত প্রশংসনীয় কাজ; তবে আপত্তির বিষয় হলো, তারা এসব ক্ষেত্রে নামাজের বহু সুন্নাত ছেড়ে মাকরুহে লিপ্ত হয়।

আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেন, আমি এক আবেদের সাক্ষাতে উপস্থিত হয়ে দেখি যে তিনি দিবসে নফল পড়ছেন এবং নামাজে উচ্চ আওয়াজে তেলাওয়াত করছেন। তখন আমি তাকে বললাম, দিবসে উচ্চ আওয়াজে তেলাওয়াত করা মাকরুহ। তখন সে আমাকে বললো, আমি ঘুম তাড়ানোর উদ্দেশ্যে উঁচু আওয়াজে তেলাওয়াত করছি। তখন আমি তাকে বললাম, ঘুম তাড়ানোর জন্যতো সুন্নাত ছাড়া যাবেনা। যখন ঘুম তোমাকে কাবু করে তখন তুমি ঘুমিয়ে নাও, কেননা তোমার উপর রয়েছে তোমার নফসের হক।

হযরত বারিদা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, من جهر بالقرائة فى النهار فارجموه بالبعر অর্থঃ

যে দিবসে উঁচু আওয়াজে (নামাজে) কোরআন তেলাওয়াত করে তাকে গোবর নিক্ষেপ করো।

একদল আবেদের অবস্থাতো এমন, শয়তানের নেক সুরতে ধোঁকার ফল স্বরুপ তারা রাতে বেশী পরিমাণে নফল পড়ে, আর তাদের কেউ সারারাত নফল এবাদতের পর ফজরের আগ মুহূর্তে ঘুমিয়ে পরে, ফলে হয় তার ফজর কাজা হয়ে যায় কিংবা জাগ্রত হয়ে নামাজের প্রস্তুতি গ্রহণের পুর্বেই জামাত ফওত হয়ে যায় অথবা জামাতের সাথে নামাজ পড়ে সত্য; তবে রাত জাগরণের দরুন শারীরিক দুর্বলতার কারণে পরিবারের জন্য উপার্জনের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।

আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেন, আমি হুসাইন কাযবীনী নামক এক বড় আবেদকে দেখেছি, যিনি দিবসে জামে মানসুরের ভিতর অধিক পরিমাণে হাটতেন। আমি হাটার কারণ জিজ্ঞেস করলে আমাকে বলা হলো, ঘুম দুর করার জন্যই এ পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। তখন আমি বললাম, শরীয়ত এবং আকলের দাবী অনুসারে এটা চরম মূর্খতা।

শরীয়তের দৃষ্টিতে মূর্খতার দলীল হলো, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, إن لنفسك عليك حقا فقم ونم অর্থঃ তোমার উপর রয়েছে তোমার নফসের হক, সুতরাং এবাদতের পাশাপাশি বিশ্রাম গ্রহণ করো। তিনি আরো বলেন, عليكم هديا قصدا فانه من يشاد هذا الدين يغلبه অর্থঃ তোমাদের উচিত সহজ পন্থা অবলম্বন করা, কেননা যে এই দীনের ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করবে সে পরাজিত হবে।

আনাস বিন মালেক বলেন, একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করে দু' স্তম্ভের মাঝে একটি রশি বাঁধা অবস্থায় দেখে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কী? তখন উপস্থিত

লোকেরা বললো, এটা যয়নব তৈরি করেছে। নামাজ পড়তে পড়তে যখন সে অলস কিংবা দুর্বল হয়ে যায় তখন রশির সাথে নিজেকে বেঁধে রাখে। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা তা খুলে ফেল। তারপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ليصل أحدكم نشاطه فاذا كسل أو فتر فليقعد অর্থঃ তোমাদের প্রত্যেকে যেন উদ্যমতার সাথে নামাজ পড়ে, অলস কিংবা দুর্বল হয়ে পরলে সে যেন বিশ্রাম করে। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, اذا نعس أحدكم فليرقد حتى يذهب عنه النوم فاذا صلى وهو ينعس لعله يذهب ليستغفر فيذهب فيسب نفسه অর্থঃ তোমাদের কারো তন্দ্রা আসলে সে যেন শুয়ে ঘুমের চাহিদা পূরণ করে, আর যদি তন্দ্রাভাব নিয়ে নামাজ পড়ে তাহলে হতে পারে সে ইস্তেগফার করতে গিয়ে নিজেকেই গালমন্দ করবে।

এতো শরীয়তের দলীল, আকলের দলীল হলো, জাগ্রতাবস্থায় কর্ম সম্পাদনে ব্যয় হওয়া শক্তিতে ঘুম নতুনত্ব দান করে, ফলে সে লাভ করে হারানো শক্তি, ফিরে পায় কর্ম সম্পাদনের নতুন উদ্যমতা। তাই প্রয়োজনের মূহুর্তে যদি মানুষ ঘুম থেকে বিরত থাকে তাহলে ঘুমের প্রভাব তার দেহে বিচরণ করে দেহ-মস্তিষ্কের ক্ষতি সাধন করে। এখন প্রশ্ন হতে পারে, পূর্ববর্তী একদল আকাবিরতো রাতব্যাপী এবাদত করতেন, এবং এটা ছিলো তাদের নিয়মিত আমল।

এ প্রশ্নের উত্তর হলো, তারা প্রথমেই রাতব্যাপী এবদত শুরু করেননি, বরং অল্প অল্প করে অনুশীলনের মাধ্যমেই রাত জাগরণের সক্ষমতা লাভ করেছেন। আর তারা রাত জাগরণ সত্ত্বেও ফজরের নামাজ

জামাতে পড়ার ব্যাপারে নিজেদের প্রতি আস্থাবান্ ছিলেন। তদুপরি অল্পাহারে অভ্যস্ত হওয়ার দরুন দুপুরের সামান্য বিশ্রামেই তাদের ঘুমের চাহিদা মিটে যেত; ফলে রাত জাগরণ সত্ত্বেও তারা ক্লান্ত হতেন না, বরং পূর্ণ উদ্যমতার সাথেই নামাজ আদায়ের সৌভাগ্য লাভ করতেন। আর হাদীসের কোন এবারতে এমনটি নেই যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন একটি রাতও না ঘুমিয়ে এবাদত করেছেন। সুতরাং রাসুলের সুন্নাতই অনুসরণযোগ্য।

কতক আবেদের অবস্থাতো এমন, তারা শয়তানের নেক ধোঁকায় রাতব্যাপী এবাদত করে দিনে তা মানুষের নিকট বলে বেড়ায়। তবে বলার কৌশল হয় বিভিন্ন রকম; ফলে তাদের কেউ বলে, আজ ফজরের আজান অমুক মুআজ্জিন দিয়েছে। উদ্দেশ্য হলো, মানুষ যেন বুঝতে পারে যে, আযানের সময় সে জাগ্রত ছিলো। তার এ আচরণকে আমরা যদি রিয়ামুক্ত মেনেও নেই, তার ক্ষতির জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, তার গোপন আমলের সওয়াব প্রকাশ্য আমল দ্বারা পরিবর্তিত হলো। ফলে তার নেকির পরিমাণ কিছুটা হলেও হ্রাস পেলো।

আবেদদের কতক এমনও আছেন, যারা সর্বদা নফল এবাদত ও যিকির-আযকার মসজিদে করে থাকেন, ফলে এক পর্যায়ে এবাদত-বন্দেগীতে তারা খ্যাতি লাভ করেন এবং ক্রমান্বয়ে লোকজন তাদের নিকট সমবেত হয়ে তাদের অনুরূপ নামাজ পড়া শুরু করেন। এভাবে তাদের এবাদতের বিষয়টি মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পরে। কোন সন্দেহ নেই যে, ইবলিসের নেক সুরতে কুচক্রান্তের শিকার হয়েই তারা এমনটি করেন। কেননা মানুষের মাঝে তাদের এবাদতের বিষয়টি ছড়িয়ে পরা এবং মানুষের মুখে তাদের উচ্চ প্রশংসার বিষয়টি জানতে পেরেই এবাদত-বন্দেগীতে তাদের নফস শক্তিশালী হয় এবং নফল

এবাদত বেশী পরিমাণে করা তাদের জন্য সহজ থেকে সহজতর হয়। তারা যা করছে তা যে শয়তানের নেক চক্রান্ত, তা প্রমাণ করতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি হাদীসই যথেষ্ট। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "إن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة" অর্থঃ পুরুষের জন্য ফরয ব্যতীত অন্যসব নামাজের সর্বোত্তম স্থান হলো মসজিদ। (বুখারী ও মুসলিম)

আমের বিন আবদে কায়েস তার নামাজ পড়া মানুষ দেখুক এটাও তিনি অপসন্দ করতেন। এ কারণেই তিনি কখনো মসজিদে নফল পড়তেন না, অথচ তার দৈনিক নফলের পরিমাণ ছিলো একহাজার রাকআত।

ইবনে আবী লায়লার ঘটনাতো এমন, তিনি নামাজ পড়াকালীন কেউ তার ঘরে প্রবেশ করলে তিনি তৎক্ষণাৎ শুয়ে পড়তেন।

কতক আবেদের অবস্থাতো এমন, তারা দোয়াকালীন সময় কান্না শুরু করলে যদি মানুষ তাদের নিকট সমবেত হয় তাহলে কান্নার গতি বাড়িয়ে দেন। অথচ নিঃশব্দে ক্রন্দন যার পক্ষে সম্ভব সে যদি সশব্দে ক্রন্দন করে তাহলে সে নিজেকে রিয়াকার হিসাবে প্রকাশ করলো।

আসেম বলেন, আবু ওয়ায়েল যখন ঘরে নামাজ পড়তেন তখন ফুঁপিয়ে কাঁদতেন। অথচ দুনিয়ার সমুদায় সম্পদের বিনিময়ে যদি কেউ তার কাঁদার দৃশ্য দেখার প্রস্তাব করতো তিনি তা কখনোই করতেন না।

আইয়্যুব সাখতিয়ানির ঘটনাতো এমন, যদি তার কান্নার বেগ বেড়ে যেত তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন।

কতক আবেদের অবস্থাতো এমন, যারা রাত দিন নফল পড়েন, কিন্তু অন্তর সংশোধন কিংবা খাদ্যের হালাল হারামের পরওয়া করেন না, অথচ নফলের আধিক্য হতে এসবের প্রতি গুরুত্ব দেয়াই তাদের জন্য উত্তম।

তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে শয়তানের ধোঁকাদানের বিবরণ।

একদল কারীর অবস্থাতো এমন, যারা অধিক পরিমাণে কোরআন তেলাওয়াত করেন, কিন্তু তারতীল তাযভীদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন না। এতো এমন পদ্ধতি, শরীয়তে যার প্রশংসা অবিদ্যমান। এখন প্রশ্ন হতে পারে, পূর্ববর্তী ওলামাদের একদলতো দিনে এক খতম কিংবা প্রতি রাকআতে এক খতম কোরআন পড়তেন। উত্তর হলো, তাদের থেকে এরূপ আমল কদাচিৎ প্রকাশ পেত। আর সর্বদা এভাবে তেলাওয়াত যদিও জায়েজ, কিন্তু তারতীল ও তাযভীদ রক্ষা করে কোরআন তেলাওয়াত ওলামাদের নিকট মুস্তাহাব। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاثة أيام অর্থঃ যে তিনদিনের কমে কোরআন খতম করে, কোরআন বুঝা তার পক্ষে সম্ভব হয়না।

একদল কারীর অবস্থাতো এমন, যারা গভীর রাতে মসজিদের মিনারে আরোহণ করে উচ্চ আওয়াজে কোরআন তেলাওয়াত করে, আর শয়তানও এ বিষয়ে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে। তাদের জেনে রাখা উচিত যে, এ ধরনের তেলাওয়াত দু' ধরনের গুনাহকে অন্তর্ভুক্ত করে। -১- মানুষের ঘুমে বিঘ্ন ঘটিয়ে কষ্ট দেয়ার গুনাহ -২- তেলাওয়াতের উদ্দেশ্য লোক দেখানো হওয়ায় রিয়াকারের গুনাহ। তাদের কেউতো

এমন, যারা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে আযানের সময় মসজিদে তেলাওয়াত করেন, কেননা তা হচ্ছে লোক সমাগমের সময়।

আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেন, এসব কারীদের যে বিষয়টি আমাকে অবাক করেছে তা হলো, এক কারীইমাম জুমআর দিন ফজর নামাজের পর মুসল্লিদের অভিমুখী হয়ে সুরা ফালাক ও সুরা নাস পড়ে কোরআন খতমের দোয়া করতেন। উদ্দেশ্য হলো, মানুষ যেন মনে করে যে, তিনি কোরআন খতম করেছেন। এমন কারীদের জেনে রাখা উচিত যে, আমাদের পূর্বসূরিদের রীতিনীতি এরূপ ছিলো না, বরং তারাতো এবাদত করতেন অতি গোপনে। কেউ তাদের এবাদত দেখুক কিংবা এবাদত সম্পর্কে অবগত হউক, এটা তারা মোটেও পসন্দ করতেন না। রাবী বিন খুছাইমতো সব আমলই গোপনে করতেন। যদি দেখে কোরআন পড়াবস্থায় কেউ তার ঘরে প্রবেশ করতো তাহলে কাপড় দিয়ে কোরআন ঢেকে ফেলতেন; যেন তার কোরআন তেলাওয়াতের বিষয়টি আগন্তুক বুঝতে না পারে। ইমাম আহমদ বিন হাম্বলতো অধিক পরিমাণে কোরআন পড়তেন, অথচ কখন তিনি কোরআন খতম করেন তা কেউ জানতেন না।

রোযার ক্ষেত্রে শয়তানের ধোঁকাদানের বিবরণ।

কিছু লোকের অবস্থাতো এমন, শয়তান যাদেরকে সর্বদা রোযা রাখতে উদ্বুদ্ধ করে। এটা জায়েজ, যদি সে রোযা রাখতে নিষিদ্ধ দিনগুলোতে রোযা হতে বিরত থাকে। তবে আপত্তি আসে দুই কারণে।

প্রথমতঃ সর্বদা রোযা রাখার দরুন শরীর দুর্বল হওয়ায় পরিবারের রুজি উপার্জনের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে এবং স্ত্রী মিলনে অক্ষম হওয়ার দরুন স্ত্রীর চারিত্রিক পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যায়। বুখারী মুসলিমের হাদীসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ان

لزوجك عليك حقا অর্থঃ নিশ্চয় তোমার উপর রয়েছে তোমার স্ত্রীর হক। সুতরাং এ নফলের দরুন কত ফরয যে নষ্ট হয় তা গণনা করা দুষ্কর।

দ্বিতীয়তঃ সর্বদা রোযা রাখার দরুন সে রোযার সর্বোত্তম ফযীলত হাতছাড়া করে। কেননা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه অর্থঃ আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় রোযা দাউদ আলাইহিস সালামের রোযা, তিনি একদিন রোযা রাখতেন একদিন পানাহার করতেন, আর আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় নামাজ দাউদ আলাইহিস সালামের নামাজ, তিনি অর্ধরাত ঘুমিয়ে রাতের এক তৃতীয়াংশ নামাজ পড়ে শেষ ষষ্ঠাংশে ঘুমাতেন।

হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রা.) বলেন, أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول لأقومن الليل ولأصومن النهار ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «آنت الذى تقول ذلك». فقلت له قد قلته يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر». قال قلت فإني أطيق أفضل من ذلك. قال «صم يوما وأفطر يومين». قال قلت فإني أطيق

أفضل من ذلك يا رسول الله قال «صم يوما وأفطر يوما وذلك صيام داود عليه السلام وهو أعدل الصيام».

قال قلت فإني أطيق أفضل من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا أفضل من ذلك». (رواه البخاري ومسلم)

অর্থঃ আমর বিন আস বলেন, আমার ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হলো যে, ইবনে আস বলে, আমি যতদিন জীবিত থাকবো ততদিন রাতভর নামাজ ও দিনভর রোযা রাখবো। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, তুমি কী এমনটি বলো? আমি তখন বললাম হে আল্লাহর রাসুল, আমি এমনটি বলেছি। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি কিছুতেই তা পারবেনা। সুতরাং তুমি একদিন রোযা রাখ একদিন পানাহার করো, রাতের কিছু সময় ঘুমাও কিছু সময় নামাজ পড়, আর মাসের তিনদিন রোযা রাখ; কেননা ভালো কাজের প্রতিদান দশগুণ বৃদ্ধি করা হয়, আর দাউদ আলাইহিস সালামের রোযা এমনই ছিলো। তখন আমর বিন আস বললেন, আমি এর চে' বেশী রাখতে সক্ষম। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাহলে একদিন রোযা রাখ আর দুই দিন পানাহার করো। তখন আমর বিন আস বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমি এর চে' বেশী রাখতে সক্ষম। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাহলে একদিন রোযা রাখ একদিন পানাহার করো, আর এটাই দাউদ আলাইহিস সালামের রোযা এবং এ রোযাই সর্বাধিক ভারসাম্যপূর্ণ।

তখন আমর বিন আস বললেন হে আল্লাহর রাসুল, আমি এর চে' বেশী রাখতে সক্ষম। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এর চে' উত্তম কোন রোযা নেই। (বুখারী ও মুসলিম)

এখন প্রশ্ন হতে পারে, পূর্ববর্তী একদল আল্লাহ ওয়ালাতো ধারাবাহিকভাবে সারাবছর রোযা রেখেছেন। আমরা বলবো, তারা ধারাবাহিকভাবে রোযা রাখা সত্ত্বেও পরিবারের রুজি উপার্জনে সক্ষম ছিলেন। কিংবা এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, তাদের অধিকাংশের পরিবার ছিলোনা; ফলে তারা উপার্জনেরও মুখাপেক্ষী ছিলেন না। অবশ্য তাদের অধিকাংশই ধারাবাহিকভাবে রোযা রাখার আমলটি জীবনের শেষ সময়ে করেছেন। তদুপরি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা «لا أفضل من ذلك» (এর চে' উত্তম কোন রোযা নেই) এসবের উত্তমতাকে প্রত্যাখ্যান করে।

রোযা পালনে এ পদ্ধতি অবলম্বনকারীদের একদলতো এমন, স্বল্প পরিমাণে শুকনো খাবার ভক্ষণের দরুন যাদের দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে যায়, এবং মগজ-মস্তিষ্ক শুকিয়ে যায়। এতো নিজের প্রতি এমন নির্যাতন যার সমর্থন শরীয়তে নেই এবং সাধ্যাতীত বিষয়ে নিজেকে বাধ্যকরন যার বৈধতা ইসলামে নেই।

আবেদদের একদল এমনও আছেন, যারা ধারাবাহিকভাবে বছরব্যাপী রোযা রাখেন এবং রোযার দরুন তাদের যশ-খ্যাতি লোক সমাজে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে তারা কখনোই রোযা হতে বিরত হন না। আর যদি কখনো রোযা ভঙ্গ করেন তাহলে লোক চক্ষুর অন্তরালে পানাহার করেন, যেন তাদের যশ-খ্যাতি লোপ না পায়। এটাতো গোপন রিয়া। যদি তার মাঝে এখলাস থাকতো এবং নিজ আমল গোপনের সদিচ্ছা থাকতো তাহলে সে ঐ ব্যক্তির সামনে পানাহার করতো, যে তার

রোযার বিষয়ে অবগত। অতঃপর পূনরায় সে এমনভাবে রোযা রাখতো যেন কেউ তা বুঝতে না পারে।

তাদের কতকের অবস্থাতো এমন, যারা রোযার বিষয়টি মানুষের নিকট বলে বেড়ায়। তাই সে বলে, আজ বিশ বছর যাবৎ আমি রোযা ভাঙ্গি নাই। আর শয়তানও এ বিষয়ে তাকে উৎসাহ দিয়ে বলে, তোমার রোযা রাখার বিষয়টি মানুষকে বলা উচিত, যেন তোমার অনুসরণে মানুষ মুক্তির পথ খুঁজে পায়। আল্লাহ তায়ালাও মানুষের উদ্দেশ্যের ব্যাপারে সম্যক অবগত।

ছুফিয়ান ছাওরী (রহ.) বলেন, মানুষ এবাদত-বন্দেগী কিছুকাল গোপনে করার পর শয়তানের নেক চক্রান্তে সে তা অন্যের নিকট প্রকাশ করে দেয়, ফলে তার গোপন আমল প্রকাশ্য আমল দ্বারা পরিবর্তিত হয়।

আবেদদের কতক এমনও আছেন, যারা স্বভাবত সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখেন। যদি সেদিন কেউ তাদেরকে দাওয়াত করে তাহলে তারা বলেন, আজ না বৃহস্পতিবার! এ কথার উদ্দেশ্য হলো, মানুষ যেন বুঝে নেয় যে, এ ব্যক্তি প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার নিয়মিত রোযা রাখেন।

তাদের কতকতো এমন, যারা নিয়মিত রোযা রাখার দরুন অন্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করে তার প্রতি বাঁকা দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন।

আবার কতকের অবস্থা এমন, যারা নিয়মিত রোযা রাখা সত্ত্বেও না ইফতারিতে হালাল-হারামের পরওয়া করেন, না রোযাবস্থায় গিবত-শেকায়েত, মহিলাদের প্রকি কুদৃষ্টি নিক্ষেপ এবং অশালিন কথাবার্তা থেকে বিরত থাকেন। আর শয়তানও তাদের মনে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল করে যে, গুনাহের ক্ষতিপূরক হিসাবে রোযাই তোমার জন্য যথেষ্ট।

এসব লোকদের জেনে রাখা উচিত যে, তারা যা করছে তা শয়তানের কুচক্রান্তেরই সুফল।

হজ্জের ক্ষেত্রে শয়তানের ধোঁকাদানের বিবরণ।

প্রথমেই আমাদের জেনে রাখা উচিত যে, একবার হজ্জ পালনের দ্বারাই মানুষের উপর থেকে হজ্জের ফরযিয়্যাত রহিত হয়ে যায়। এতদসত্ত্বেও বহু লোক এমন আছেন, যারা হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে বারবার মক্কা অভিমুখে সফর করেন। এটা যে পূণ্যের কাজ এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ ও আপত্তি উত্থাপন এক মারাত্মক অন্যায়। কিন্তু আপত্তি তখনি আসে, যদি এ হজ্জ পালন পিতা মাতার অসন্তুষ্টির কারণ হয়, অথবা হজ্জ পালনকারী জুলুম করে মাজলুম থেকে জুলুমের ক্ষমা না নিয়ে থাকে, অথবা হজ্জ পালনের উদ্দেশ্য যদি হয় আনন্দ-বিনোদনে মন উৎফুল্ল করা, অথবা এমন মাল দ্বারা হজ্জ করা যা সন্দেহযুক্ত, কিংবা এ উদ্দেশ্যে হজ্জ পালন করা, যেন মানুষ তাকে হাজী সাহেব বলে।

এদের অধিকাংশের অবস্থা এমন, যারা হজ্জের সফরে পবিত্রতা ও নামাজের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ ফরয নষ্ট করেন, আর কা'বার চারপাশে সমবেত হন এমন অন্তর নিয়ে যা কলুষিত, এমন হৃদয় নিয়ে যা অপবিত্র। অথচ হজ্জের উদ্দেশ্যই হলো অন্তরের নৈকট্য – দেহের নৈকট্য নয়, আর অন্তরের নৈকট্যতো তাক্বওয়ার দ্বারাই অর্জিত হয়। সুতরাং হজ্জ পালনে যে তাক্বওয়ার পথ এড়িয়ে চলে, এমন হজ্জ এ ব্যক্তির কী উপকারে আসবে!

একদল লোক এমনও আছেন, হজ্জের পরিমাণ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে যারা বহুবার হজ্জ করে বলেন, আমি বিশবার হজ্জ করেছি। আবার কিছুলোক এমনও আছেন, যারা দীর্ঘকাল কা'বার পাশাপাশি অবস্থান

করা সত্ত্বেও অন্তর পবিত্র করার প্রতি মনোযোগ দেন না; বরং দম্ভকরে বলেন, আজ বিশ বছর যাবত ক'বার পাশে অবস্থান করছি।

হজ্জ পালনকারীদের একদল এমনও আছে, যারা নামাজ নষ্ট করে এবং ওজনে কম দেয়, আর শয়তান তাদেরকে ধারণা দেয় যে, এসবের ক্ষতিপূরক হিসাবে হজ্জই তোমার জন্য যথেষ্ট।

হজ্জ পালনকারীদের একদল এমনও আছেন, যারা হজ্জের পালনীয় কাজসমূহে এমন রীতি-নীতি আবিষ্কার করেন যার অস্তিত্ব শরীয়তে নেই। আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেন, হজ্জ পালনকারীদের এক জামাআতকে আমি দেখেছি, যারা এক কাঁধ হতে ইহরামের কাপড় খুলে দেন এবং দীর্ঘকাল সূর্যের নিচে অবস্থান করেন, ফলে তাদের ত্বক নষ্ট হয়ে যায় আর মাথার চামড়া ফেটে যায় এবং এর মাধ্যমেই তারা মানুষের মাঝে নতুন বেশ ধারণ করেন। বুখারী শরীফের হাদীসে ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক লোককে দেখলেন যে, সে মুখে লাগাম বেঁধে ক'বাঘর তাওয়াফ করছে, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার লাগাম কেটে দেন। অন্য রেওয়ায়েতে এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখলেন যে, এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির নাকে লাগামের আংটা লাগিয়ে তাওয়াফ করাচ্ছে, তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা কেটে দেন এবং লোকটিকে হাত ধরে তাওয়াফ করানোর নির্দেশ দেন।

আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেন, এ হাদীস ধর্মের বিষয়ে এমন কিছু উদ্ভাবনের নিষেধাজ্ঞাকে শামিল করে যার নযির শরীয়তে নেই, যদিও উদ্ভাবনকারী নেক নিয়্যাতেই তা আবিষ্কার করুক।

আবেদদের একদল এমনও আছেন, যারা তাওয়াক্কুলের দাবিদার, তাই তারা পাথেও ছাড়া হজ্জের সফরে বেড়িয়ে যান। তাদের ধারণা এটাই প্রকৃত তাওয়াক্কুল। অথচ এরুপ তাওয়াক্কুলের নযির শরীয়তে নেই, বরং শরীয়ত তাদের ধারণাকে ভুল প্রমাণিত করে।

এক ব্যক্তি ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে (রহ.) বললো, আমি পাথেও ছাড়া আল্লাহর উপর ভরসা রেখে হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কা যেতে চাই। তখন আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) তাকে বললেন, তাহলে কোন কাফেলার সাথে শরীক হওয়া ব্যতীত একাকী সফর করো। তখন লোকটি বললো, কাফেলার সাথে শরীক হওয়া ব্যতীত একাকী সফর আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তখন আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) তাকে বললেন, তাহলেতো মানুষের ঝুলির উপর তুমি তাওয়াক্কুল করেছো।

জিহাদের ক্ষেত্রে শয়তানের ধোঁকাদানের বিবরণ।

আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেন, মানুষ জিহাদে বের হয় কিন্তু তাদের নিয়্যাত থাকে বিভিন্ন রকম। কারো উদ্দেশ্য হয় গৌরব-প্রতিযোগিতা ও আত্মপ্রদর্শন, যেন মানুষ তাকে গাজী কিংবা সাহসী উপাধিতে ভূষিত করে। অথবা গনীমত লাভের আশা তাদেরকে জীহাদের প্রতি অনুপ্রাণিত করে। অথচ নিয়্যাত অনুপাতেই আমলের প্রতিদান নির্ণীত হয়।

আবু মুসা আশআরী (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বললো, আচ্ছা বলুনতো হে আল্লাহর রাসুল, এক ব্যক্তি বীরত্ব প্রকাশের উদ্দেশ্যে লড়াই করে, এক ব্যক্তি অহঙ্কার প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে লড়াই করে, আরেক ব্যক্তি আত্মপ্রদর্শনের উদ্দেশ্যে লড়াই করে; এদের কোনজন আল্লাহর রাস্তায় রয়েছে? তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম

বললেন, من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله অর্থঃ আল্লাহর দীন পৃথিবীতে সমুন্নত হওয়ার উদ্দেশ্যে যে লড়াই করে সে আল্লাহর রাস্তায় রয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)

ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, খবরদার! তোমরা এ কথা বলবেনা যে, অমুক ব্যক্তি শহীদ হয়েছে। কেননা জিহাদে অংশ গ্রহণকারীদের নিয়্যাত বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে; কেউ জিহাদ করে গনীমত লাভের আশায়, কেউ জিহাদ করে আলোচিত হওয়ার আশায়, আবার কেউ জিহাদ করে বীর উপাধির আশায়।

আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

أول الناس يقضى لهم يوم القيامة ثلاثة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت ليقال فلان جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب قال أبو عبد الرحمن ولم أفهم تحب كما أردت أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك

قال كذبت ولكن ليقال إنه جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في النار অর্থঃআবু হুরাইরা (রা.) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যে তিন ব্যক্তির ফায়সালা হবে তাদের একজন হবেন শহীদ। তাকে উপস্থিত করে তার প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতরাজির কথা উল্লেখ করলে সে তা স্বীকার করবে। তখন আল্লাহ তাকে বলবেন, এ নেয়ামত ভোগ করে তুমি কী আমল করেছো? সে উত্তরে বলবে, তোমার রাস্তায় জিহাদ করে জীবন উৎসর্গ করেছি। তখন আল্লাহ বলবেন তুমি মিথ্যা বলেছো। বরং বীর উপাধি লাভের আশায় তুমি লড়াই করেছে এবং সে উপাধি তোমার লাভ হয়েছে। অতঃপর আল্লাহর নির্দেশে তাকে অধঃমুখ করে টেনে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি এমন, যে এলেম শিখার পর অন্যকে শিখিয়েছে এবং কোরআন তেলাওয়াত করেছে। তাকে উপস্থিত করে তার প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতরাজির কথা উল্লেখ করলে সে তা স্বীকার করবে। তখন আল্লাহ তাকে বলবেন, এ নেয়ামত ভোগ করে তুমি কী আমল করেছো? সে উত্তরে বলবে, আমি তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে ইল্‌ম শিখে অন্যকে তা শিখিয়েছি এবং নিয়মিত কোরআন তেলাওয়াত করেছি। তখন আল্লাহ বলবেন তুমি মিথ্যা বলেছো। বরং আলেম উপাধি লাভের আশায় তুমি ইল্‌ম শিখেছো এবং সে উপাধি তোমার লাভ হয়েছে, আর ক্বারী উপাধি লাভের আশায় তুমি কোরআন পড়েছো এবং সে উপাধিও তোমার লাভ হয়েছে। অতঃপর আল্লাহর নির্দেশে তাকে অধঃমুখ করে টেনে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

তৃতীয় ব্যক্তি এমন, যাকে আল্লাহ বিপুল পরিমাণে সব ধরনের মাল দিয়েছেন। তাকে উপস্থিত করে তার প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতরাজির কথা উল্লেখ করলে সে তা স্বীকার করবে। তখন আল্লাহ তাকে বলবেন, এ নেয়ামত ভোগ করে তুমি কী আমল করেছো? সে উত্তরে বলবে, আপনার পসন্দনীয় এমন কোন খাত নেই যাতে আপনার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আমার সম্পদ ব্যয় হয়নি। তখন আল্লাহ বলবেন তুমি মিথ্যা বলেছো। বরং সম্পদ ব্যয় তুমি এজন্য করেছো, যেন মানুষ তোমাকে দানশীল বলে, আর তা বলাও হয়েছে। অতঃপর আল্লাহর নির্দেশে তাকে অধঃমুখ করে টেনে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (মুসলিম)

আবু হাতেম রাজি বলেন, আমি আবদাহ বিন সোলাইমানকে বলতে শুনেছি, আমরা রোম দেশে আবদুল্লাহ বিন মোবারকের সাথে এক অভিযানে ছিলাম। হঠাৎ আমরা এক শত্রু বাহিনীর সম্মুখীন হলাম। যখন দু'দল মুখোমুখী হলো তখন শত্রুপক্ষের এক ব্যক্তি বের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান জানালে আমাদের একজন তার দিকে এগিয়ে গেলো, এবং কিছুক্ষণ তার সাথে লড়াই করে তাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিলো। অতঃপর অন্য ব্যক্তি এগিয়ে এলে তাকেও হত্যা করে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিলো। এভাবে চার পাঁচ জনকে জাহান্নামে পাঠানোর পর আমাদের লোকটি শত্রুপক্ষকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান জানালে শত্রু পক্ষের এক ব্যক্তি বের হয়ে পরস্পর লড়াই শুরু করলে শত্রু পক্ষের লোকটি এক পর্যায়ে আমাদের লোককে শহীদ করে দেয়। তখন লোকেরা তার লাশের পাশে ভীর জমালে আমিও তাদের সাথে সমবেত হয়ে দেখতে পাই, তিনি জামার আস্তিন দ্বারা চেহারা ঢেকে রেখেছেন। তখন আমি তার আস্তিনের এক প্রান্ত ধরে হাত প্রসারিত করলে দেখতে পাই, তিনি আবদুল্লাহ বিন মোবারক (রহ.)।

তখন আমি বললাম, (আল্লাহ তোমাদের প্রতি রহম করুন) তোমরা এ মুখলিস নেতাকে দেখ, মানুষ তাকে দেখে তার প্রশংসা করার ভয়ে কিভাবে সে নিজেকে গোপন করেছে।

ইবরাহিম বিন আদহাম জিহাদ করতেন। যখন লোকেরা গনীমতের মাল ভাগ করতো তিনি গনীমতের কোন অংশ নিতেন না, যেন আখেরাতে পূর্ণ প্রতিদান লাভ করেন।

গনীমত লাভের পর শয়তান বহু মুজাহিদকে ধোঁকাগ্রস্ত করে। ফলে গনীমতের সম্পদ সে এ পরিমাণ গ্রহণ করে যা তার অধিকার বহির্ভূত। এদের কিছু সংখ্যক এমন যারা অজ্ঞতার কারণে মনে করে যে, কাফেরের সম্পদ যে যা নিতে পরাবে তা তার জন্য বৈধ। অথচ তাদের জানা নেই যে, গনীমতের মাল আত্মসাৎ এক মহা অন্যায়।

বুখারী মুসলিমের হাদীসে আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, عن أبي هريرة قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، ففتح الله علينا فلم نغنم ذهبا ولا ورقا غنمنا المتاع والطعام والثياب ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله فرمى بسهم فكان فيه حتفه فقلنا هنيئا له الشهادة يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «كلا والذي نفس محمد بيده إن الشملة لتلتهب عليه نارا أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم». قال ففزع الناس. فجاء رجل بشراك أو شراكين. فقال يا رسول الله أصبت يوم خيبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «شراك من نار أو

شراكان من نار». অর্থঃ আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে খায়বারের যুদ্ধে বের হলাম। যুদ্ধে এক পর্যায়ে আল্লাহ আমাদেরকে বিজয় দান করলে খাবার, জামা-কাপড় ও বহু আসবাবপত্র আমরা গনীমত স্বরুপ লাভ করি, তবে কোন সোনা রুপা আমাদের হস্তগত হয়নি। অতঃপর আমরা এক উপত্যকার দিকে যাত্রা শুরু করি। এ যাত্রায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের মালিকানাধীন এক গোলাম তার সাথে ছিলো। যখন আমরা উপত্যকায় যাত্রা বিরতি করি, তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের গোলাম তার মালপত্র খোলার প্রস্তুতি নিলে এক তীর এসে তার রুহ ছিনিয়ে নেয়। তখন আমরা বললাম হে আল্লাহর রাসুল, কী সৌভাগ্য তার! সেতো শাহাদাতের মওত লাভ করেছে। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কিছুতেই নয়; বন্টনবিহীন যে আলখিল্লা খায়বার যুদ্ধে সে আত্মসাৎ করেছে তার আগুনে সে অবশ্যই দগ্ধ হবে। এ কথা শ্রবণে উপস্থিত লোকেরা ভীত-সন্ত্রস্ত হলো। তখন এক ব্যক্তি জুতোর দু' / একটি ফিতা এনে বললো হে আল্লাহর রাসুল, আমি তা খায়বারের দিন নিয়েছিলাম। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এতো আগুনের ফিতা; অথবা বলেছেন, এ ফিতাদ্বয়তো আগুনের।

এতো ধোঁকাগ্রস্ত অজ্ঞ মুজাহিদের অবস্থা। এবার শুনুন শরীয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞাত মুজাহিদের হালত।

শরীয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও মুজাহিদদের কতক এমনও আছেন, যারা সম্পদের আধিক্য দেখে ধৈর্যহারা হয়ে ধারণা করেন, আমার জিহাদ মাল আত্মসাতের ক্ষতিপূরক হবে। এসব

ক্ষেত্রেই ইমান ও ইলমের নিদর্শন স্পষ্ট হয়ে যায়। আবু ওবায়দা আনবরী বলেন, মুসলমানরা যখন মাদায়েন অবতরণ করে গনীমতলব্ধ মাল জমা করতে লাগলো তখন এক ব্যক্তি এসে তার কাছে বিদ্যমান গনীমতের মাল জমাকারীর নিকট জমা দিলে জমাকারীর সাথী বললো, এমন উদার দীল মানুষতো আমরা দেখিনি। সে যা জমা দিয়েছে তার মূল্যতো আমাদের গনীমতলব্ধ সব সম্পত্তি ছাড়িয়ে যাবে। সে তখন বললো, তুকি কী এখান থেকে নিজের জন্য কিছু রেখেছো? লোকটি বললো, আল্লাহর কসম; যদি আল্লাহর ভয় আমার দীলে না থাকতো তাহলে তোমাদের নিকট আমি তা কিছুতেই জমা দিতাম না। তারা তখন বুঝলো যে, লোকটি বড় মাপের কোন ব্যক্তি হবেন। তারা পরিচয় জানার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞেস করলো, কে আপনি? কি আপনার পরিচয়? সে বললো, আল্লাহর কসম; তোমাদের স্তুতি লাভের উদ্দেশ্যে তোমাদেরকে আমার পরিচয়ও দিবোনা এবং তোমাদের উচ্চ প্রশংসা পাওয়ার আশায় তোমাদেরকে প্ররোচিতও করবোনা। বরং আমি আল্লাহর প্রশংসা করি এবং তার প্রতিদানেই আমি সন্তুষ্ট। তখন পরিচয় জানার উদ্দেশ্যে তারা এক ব্যক্তিকে তার পিছু পাঠায়। লোকটি নিজ সম্প্রদায়ের নিকট পৌঁছলে সে তার সাথীদেরকে তার পরিচয় জিজ্ঞেস করলে তারা বললো, ইনি আমের বিন আবদে কায়স (রহ.)।

তৃতীয় অধ্যায়

সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে বাঁধাদানকারীদেরকে শয়তানের ধোঁকাদানের বিবরণ।

সৎকাজে আদেশকারী ও অসৎকাজে বাঁধা দানকারীরা দু' প্রকার – আলেম ও জাহেল। ইবলিস আলেমদেরকে দু' পদ্ধতিতে ধোঁকা দেয়।

প্রথম পদ্ধতিঃ তারা এ কাজটিকে খ্যাতি অর্জন, আলোচিত হওয়া ও বড়াই প্রকাশের হাতিয়ার রুপে গ্রহণ করে। অথচ আমাদের পূর্বসুরীরা এর সবগুলোকে এড়িয়ে চলতেন।

আবু সোলাইমান বলেন, জুমআর খুৎবায় খলীফা আবু জা'ফর মানসুরকে কাঁদতে শুনে আমার ক্রোধ এসে যায়। ফলে খুৎবা শেষে নামার সময় দাঁড়িয়ে তার কৃতকর্মের ব্যাপারে তাকে নসীহত করার সংকল্প করি। কিন্তু মানুষের উপস্থিতিতে দাঁড়িয়ে কোন খলীফাকে নসীহত করা আমার নিকট অপসন্দনীয় মনে হলো। কেননা এতে মানুষের দৃষ্টি আমার দিকে নিবদ্ধ হবে এবং তা আমার খ্যাতি অর্জনের

কারণ হবে। তদুপরি বাদশাহর পক্ষ হতে আসবে আমাকে অন্যায়ভাবে হত্যার শাহি ফরমান। তাই আমি চুপকরে বসে রইলাম।

দ্বিতীয় পদ্ধতিঃ নিজস্বার্থে ক্রোধান্বিত হওয়া।

সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে বাঁধা প্রদানকালে সম্বোধিত ব্যক্তি হতে কোনরুপ অপমানকর আচরণ প্রকাশ পেলে তার প্রতি রেগে যাওয়া। ফলে যে ক্রোধ আল্লাহর জন্য ছিলো তা উল্টো নিজ স্বার্থ হাসিলের কারণ হয়ে যায়। এরুপ পরিস্থিতিতে আমাদের আকাবিররাতো দন্ড প্রয়োগ হতেও বিরত থাকতেন। ওমর বিন আবদুল আজীজ এক ব্যক্তিকে বললেন, যদি আমি ক্রোধান্বিত না হতাম তাহলে তোমার উপর শাস্তি প্রয়োগ করতাম। তার এ কথার মর্ম হলো, তুমি যেহেতু আমাকে ক্রোধান্বিত করছো তাই আমার আশঙ্কা হলো যে, এ মূহুর্তে তোমাকে শাস্তি প্রদান করলে আল্লাহর জন্য উৎসারিত ক্রোধের সাথে নিজ ক্রোধের সংমিশ্রণ ঘটবে।

এতো সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে বাঁধা দানকারীদের আলেম শ্রেণীর বিবরণ, এবার শুনুন জাহেল শ্রেণীর হালত।

সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে বাঁধা দানকারী ব্যক্তি যদি জাহেল হয় তাহলে শয়তান তাকে নিয়ে খেলা করে। ফলে তার আদেশ-নিষেধের দ্বারা সংশোধনের চে' বিশৃঙ্খলা বেশী ছড়ায়। কেননা সে অজ্ঞতা বশত কখনো এমন বিষয়ে বাধা প্রদান করে যা সর্বসম্মতভাবে বৈধ, আর কখনো এমন বিষয়ে বিরোধিতা করে যাতে ব্যাখ্যার অবকাশ রয়েছে এবং কতক মাযহাবেও তার উপর আমল রয়েছে। আবার কখনো দরজা ভেঙ্গে অথবা দেয়াল টপকিয়ে মন্দকর্ম সম্পাদনকারীদের মারধর করে তাদেরকে দোষারোপ করে। যদি তারা কোন উত্তর দেয় তাহলে তা তাকে ভীষণ পিড়া দেয়। ফলে আল্লাহর জন্য উৎসারিত ক্রোধের উপর নিজ ক্রোধ প্রাধান্য পায়।

আবার কখনো সে এমন বিষয় প্রকাশ করে দেয় শরীয়ত যা গোপন করার আদেশ করেছে। ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে এমন সম্প্রদায়ের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলো, যাদের সাথে রয়েছে ঢাকনাবৃত মদ। তিনি বললেন, যদি তা ঢাকনাবৃত হয় তাহলে তোমরা তা ভেঙ্গোনা।

তাকে আরেক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়, যিনি বাঁশি তবলার আওয়াজ শুনেন কিন্তু সে আওয়াজ কোথা হইতে ভেসে আসছে তা তার জানা নেই। তিনি তখন বললেন, অদৃশ্য বিষয়ের অনুসন্ধান তোমার দায়িত্ব নয়, সুতরাং তার অনুসন্ধান হতে নিজেকে বিরত রাখ।

আবার কখনো মন্দকাজ হতে বাঁধা দানকারী এ ব্যক্তি মন্দকর্ম সম্পাদনকারীর বিষয়টি এমন ব্যক্তির নিকট পেশ করে যে তার উপর জুলুম করবে, অথচ ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) বলেছেন, তুমি যদি জানো যে, এ ব্যক্তির মন্দ কর্মের বিষয়টি বদশাহর নিকট পেশ করলে তিনি শরীয়ত মোতাবেক শাস্তিদান করবেন তাহলে তার নিকট তা পেশ করো।

মন্দকাজ হতে বাঁধা দানকারীদেরকে শয়তান ধোঁকা দেয়ার আরেক পদ্ধতি হলো, সে যখন মন্দ কাজের বিরোধিতা করে তখন কোন এক মজলিসে বসে মন্দ কাজের বিবরণ তুলে ধরে এবং তা নিয়ে সে গর্ববোধ করে। অতঃপর সে মন্দকর্ম সম্পাদনকারীদেরকে ক্রোধান্বিত ব্যক্তির ন্যায় গালিগালাজ করে তাদেরকে লা'নত করে।

অথচ এমনও হতে পারে, যাদেরকে সে গালিগালাজ করে লা'নত করছে তারা কৃত মন্দকাজ হতে তাওবা করেছে। ফলে মন্দকর্মের উপর অনুশোচনার দরুন তারা হয়ে যায় শ্রেষ্ঠ, আর বরত্ব প্রকাশের দরুন সে হয়ে যায় নিকৃষ্ট। আর মুসলমানের দোষ প্রকাশ করে সে

দলভুক্ত হয় ঐসব লোকদের যাদের সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. অর্থঃ যে ব্যক্তি মুসলমানের দোষ অনুসন্ধান করবে আল্লাহ তার দোষ প্রকাশ করে দিবেন, আর আল্লাহ যার দোষ প্রকাশ করবেন তাকে তিনি লাঞ্ছিত করবেন, যদিও সে রুদ্ধদার কক্ষে থাকুক।

ইবনে ওমর একদিন কা'বার দিকে তাকিয়ে বললেন, ما أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمن أعظم عند الله حرمة منك অর্থঃ হে কা'বা! তুমি কত মহান, কী মহান তোমার মর্যাদা; তবে আল্লাহর নিকট একজন মুমিনের মর্যাদা তোমার থেকে অনেক বেশী।

অন্য হাদীসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة অর্থঃ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে অন্য ব্যক্তির দোষ গোপন করবে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তার দোষ গোপন করবেন।

আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেন, মন্দকাজে বাঁধাদানের রীতিনীতি সম্পর্কে অজ্ঞ এমন ব্যক্তি সম্পর্কে আমি শুনেছি, সে ধারণার বশীভূত হয়ে মন্দকর্ম সম্পাদনকারীদের উপর অতর্কিত হামলা চালিয়ে তাদেরকে কষ্টদায়ক শাস্তি দেয়, তাদের পাত্রে কি রয়েছে তা নিশ্চিতভাবে জানার আগেই পাত্র সমূহ ভেঙ্গে ফেলে। এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, শরীয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে অজ্ঞতাই তাদেরকে এরূপ করতে উদ্বুদ্ধ করে।

আর শরীয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞাত ব্যক্তি যখন মন্দকাজ থেকে বাঁধাদান করে তখন মানুষের জানমাল ও ইজ্জত-আব্রু থাকে সম্পূর্ণ

নিরাপদ। আমাদের পূর্বসূরিরাতো মন্দকাজে বাঁধাদানের ক্ষেত্রে কোমলতা প্রদর্শন করতেন। সিলাহ বিন আশয়াম কোন ব্যক্তিকে এক মহিলার সাথে কথা বলতে দেখে বললেন দেখ, আল্লাহ কিন্তু তোমাদেরকে দেখছেন; আল্লাহ আমাদের এবং তোমাদের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখুন।

আরেকদিন খেল-তামাসায় লিপ্ত এক সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে তাদেরকে বললেন, হে ভাইয়েরা! এমন ব্যক্তি সম্পর্কে তোমাদের কী মন্তব্য, যে দীর্ঘ পথ পাড়ি দেয়ার ইচ্ছা করেছে, অথচ রাত কাটে তার নিদ্রাবস্থায় আর দিন অতিবাহিত হয় খেল-তামাসায়। আচ্ছা বলোতো, এ ব্যক্তির সফর কবে শেষ হবে!

তখন তাদের একজন সতর্ক হয়ে বললো, হে সম্প্রদায়ের লোকেরা, এ ব্যক্তিতো আমাদেরকে শিখাচ্ছেন। সে তখন তাওবা করে তার সাহচর্য গ্রহন করে।

আর মন্দকাজের বিরোধিতার ক্ষেত্রে কোমল ব্যবহার লাভের সর্বাধিক হকদার রাজা-বাদশাহ ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ। তাই তাদেরকে হেকমতের সহিত এভাবে বলা, আল্লাহ আপনাদের মর্যাদা উঁচু করেছেন, তাই আপনারা তার নেয়ামতের মর্যাদা উপলব্ধি করুন; কেননা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দ্বারাই নেয়ামত স্থায়িত্ব লাভ করে। তাই নেয়ামত ভোগের বিপরিতে আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত হওয়া - এটাতো অনুত্তম আচরণ।

শয়তানের নেক সুরতে ধোঁকার ফলস্বরুপ কিছু আবেদ এমনও আছেন, যারা কোন মন্দকাজ হতে দেখলে তার বিরোধিতা করেন না। তারা বলেন, সৎকাজে আদেশ ও মন্দকাজে বাঁধাদানতো ঐ ব্যক্তি করবে যে সৎকর্মশীল ও পরিশুদ্ধ হৃদয়ের অধিকারী। আর আমিতো সৎকর্মশীল নই, তাই সৎকাজে আদেশ ও মন্দকাজে বাঁধাদান আমার

জন্য শোভনীয় নয়।

এমন ব্যক্তিদের জেনে রাখা উচিত যে, তারা যা ধারণা করছে তা সম্পূর্ণ ভুল। কেননা সৎকাজে আদেশ ও মন্দকাজে বাঁধাদানতো প্রত্যেকের উপর ওয়াজিব, যদিও মন্দকাজের এ প্রবণতা তাদের মাঝে থাকুক। তবে মন্দকাজে বাঁধাদানকারী ব্যক্তি যদি মন্দকাজ হতে বিরত সৎকর্মপরায়ণ হয় তাহলে মন্দকাজে তার বাঁধাদান মানুষকে প্রভাবিত করবে, আর সে যদি মন্দকাজ হতে বিরত সৎকর্মপরায়ণ না হয় তাহলে মন্দকাজে তার বাঁধাদান মানুষকে না প্রভাবিত করার উপক্রম হবে। তাই মন্দকাজে বাঁধাদানকারীর উচিত নিজেকে পরিশুদ্ধ করা, যেন তার বাঁধাদান মানুষকে প্রভাবিত করে।

ইবনে আক্বীল বলেন, আমাদের যামানায় আমি আবু বকর আক্বফালিকে খলীফা থাকাকালীন দেখেছি, তিনি যখন কোন মন্দকাজে বাঁধাদানের প্রস্তুতি নিতেন তখন তার সাথে এমন বুযুর্গদের নিয়ে যেতেন যারা নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্য দ্বারাই আহার করতেন। তাদের অন্যতম হলেন, বিখ্যাত বুযুর্গ আবু বকর খাব্বাজ (রহ.); যিনি খাবার পাকাতে চুলায় লাকরি ফুঁকানোর দরুন তার চোখের জ্যোতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

জাহেদদের উপর শয়তানের নেক চক্রান্তের বিবরণ

শরীয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ সাধারণ লোকের অবস্থা হলো, সে যখন কোরআন হাদীসে দুনিয়ার নিন্দা শ্রবণ করে তখন ধারণা করে যে, পরকালে মুক্তির একমাত্র উপায় হলো দুনিয়া বর্জন করা। অথচ দুনিয়া কোন্ বিবেচনায় নিন্দিত সে হাক্বীকত তার সামনে উন্মোচিত নয়। ফলে ইবলিস নেক সুরতে ধোঁকা দিয়ে তাকে বলে, দুনিয়া বর্জন ব্যতীত পরকালে মুক্তিলাভ কোনভাবেই সম্ভব নয়। ইবলিসের নেক প্রলোভনে উৎসাহিত হয়ে এ ব্যক্তি সোজা পাহাড়ে চলে যায়। ফলে জুমআর নামাজ, জামাআতে শরীক হওয়া ও ইলম অর্জন থেকে বঞ্চিত হয়ে সে বন্য পশু-পাখির ন্যায় জীবন যাপন শুরু করে। আর ইবলিস তার দিলে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল করে যে, প্রকৃতপক্ষে এটাই দুনিয়াবিমুখতা। আর কেনইবা তার দিলে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হবেনা, অথচ তার কান শ্রবণ করেছে যে, অমুক আখেরাতে

মুজিলাতের আশায় বন-জঙ্গল ও সাগর-উপকূল ঘুরে বেড়িয়েছেন, আর অমুক পাহাড়ের নির্জন গুহায় রাতদিন এবাদত করেছেন! অথচ তাদের জানা নেই যে, এসব লোকদের অন্ধ অনুকরণে তাদের পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়, আর সন্তানের বিচ্ছেদ বেদনায় মা-বাবা অঝোরে কাঁদে। এদের অধিকাংশের অবস্থা এমন, নামাজের বিধি-বিধান যাদের ভালোভাবে জানা নেই, আর কতকের হালত এমন, যারা অন্যের প্রতি জুলুম করে মাজলুম থেকে ক্ষমা চেয়ে আখেরাতে মুক্তির পথ সুগম করেনি। শয়তান এদেরকে নেক সুরতে ধোঁকা দেয়ার সুযোগ লাভের একমাত্র কারণ শরীয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে এদের অজ্ঞতা। এসব লোকদের জেনে রাখা উচিত, তারা যতটুকু জানে তা নিয়ে নিজের প্রতি সন্তুষ্ট থাকাও এক প্রকার মূর্খতা। শরীয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে বিজ্ঞ কোন ফক্বীহের সাহচর্য লাভের সুযোগ যদি এদের হতো তাহলে ফক্বীহ সাহেব তাদেরকে অবশ্যই শিখাতেন যে, দুনিয়া সত্তাগতভাবে নিন্দিত নয়। আর এমন বস্তু কিভাবে নিন্দিত হবে যাকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন এবং মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষায় যার প্রয়োজন অনস্বীকার্য, ইলম অর্জন ও এবাদত পালনে যার সাহায্য একমাত্র উপায়! কেনইবা নয়, বেঁচে থাকার জন্য খাবার-পানীয়, সতর ঢাকতে পোষাক-পরিচ্ছদ, ইলম অর্জন ও এবাদত পালনে মাদারাসা-মসজিদ – এর কোনটি দুনিয়ার অংশ নয়? হাঁ, দুনিয়ার নিন্দা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, দুনিয়ার এমন বস্তু গ্রহণ করা যা বৈধ নয় কিং বৈধ বস্তুকে এমনভাবে গ্রহণ করা যা শরীয়ত সম্মত নয় অথবা এ পরিমাণ গ্রহণ করা যা বৈধতার সীমা ছাড়িয়ে অপচয়ের গন্ডিতে প্রবেশ করে। পক্ষান্তরে দুনিয়ার ভোগসামগ্রী প্রয়োজন অনুপাতে গ্রহণকরা শরীয়তের দৃষ্টিতে নিন্দনীয় নয়।

আর এবাদতের উদ্দেশ্যে নির্জন পাহাড়ে চলে যাওয়াতো শরীয়তে নিষিদ্ধ। কেননা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম একাকী রাত্রি যাপন হতে মানুষকে নিষেধ করেছেন। আর পাহাড়ে অবস্থানের দরুন জুমআর নামাজ ও জামাআতে শরীক হওয়া থেকে নিজেকে বঞ্চিত করাতো ক্ষতি – লাভ নয়। ইলম অর্জন ও আলেম-ওলামাদের থেকে নিজেকে দূরে রাখার দরুন মূর্খতার প্রভাব শক্তিশালী হয়। পিতা-মাতা হইতে এভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়াতো অবাধ্যতা, আর পিতা-মাতার অবাধ্যতা কবীরা গুনাহের অন্তর্ভূক্ত।

আর যাদের ব্যাপারে শোনা যায় যে, তারা এবাদতের উদ্দেশ্যে পাহাড়ে অবস্থান করেছেন তাদের অবস্থা সম্ভাবনাযুক্ত, কেননা হতে পারে তাদের পরিবার-পরিজন ও পিতা-মাতা কেউ ছিলোনা; তাই তারা নির্জন পাহাড়ে গমন করে একত্রে সমবেত হয়ে আল্লাহর এবাদতে লিপ্ত হয়েছেন। আর যার অবস্থার সঠিক সম্ভাবনা নেই সে ছিলো ভুলের উপর।

পূর্বসূরিদের একজন বলেছেন, আমরা এক পাহাড়ে সমবেত হয়ে এবাদতে লিপ্ত হলে সুফিয়ান ছাওরী এসে আমাদেরকে তাড়িয়ে দেন।

শয়তান জাহেদদেরকে নেক সুরতে ধোঁকা দেয়ার আরেক পদ্ধতি হলো, সে তাদেরকে দুনিয়াবিমুখতায় লিপ্ত রেখে ইলম অর্জন থেকে বিরত রাখে, ফলে সে উৎকৃষ্টের বিনিময়ে সাধারণকে গ্রহণ করে। ইলম অর্জনে লিপ্ত হওয়া দুনিয়া বিমুখতায় লিপ্ত হওয়ার চে' শ্রেষ্ঠ হওয়ার দলীল হলো, জাহেদের এবাদতের উপকারিতা তার এবাদতখানার মাঝেই সীমাবদ্ধ, সে উপকারিতা এবাদতখানার চৌকাঠও অতিক্রম করেনা। আর আলেমের ইলমের উপকারিতা সংক্রমণশীল, সে উপকারিতা ছড়িয়ে পরে সারা বিশ্বব্যাপী, ফলে পথহারা মানুষ খুঁজে পায় পথের দিশা, অজ্ঞব্যক্তি লাভ করে

শরীয়তের জ্ঞান-বিধি-বিধান, আর এসবের সওয়াব তার আমলনামায় যোগ হয় অনন্ত চিরকাল।

শয়তান জাহেদদেরকে নেক সুরতে ধোঁকা দেয়ার আরেক পদ্ধতি হলো, সে তাদের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল করে যে, দুনিয়া বিমুখতার নিদর্শন হলো বৈধ ভোগসামগ্রী বর্জন করা। ফলে তাদের কারো অবস্থা হলো তারা খাদ্য হিসাবে শুধুমাত্র যবের রুটিকেই গ্রহণ করে, আর কতকের অবস্থা হলো তারা ফলের স্বাদগ্রহণ থেকে নিজেকে বিরত রাখে, আর কতকের অবস্থা এমন যারা যৎসামান্য খাবারই গ্রহণ করেন, ফলে ক্রমাণ্বয়ে তাদের দেহ শুকিয়ে যায়, আর কতকের অবস্থা এমন যারা পশমীপোষাক পরিধান করে নিজেকে কষ্ট-অস্থিরতার সম্মুখীন করেন, আর কতকতো এমন যারা ঠান্ডাপানি কখনোই পান করেন না। তাদের জেনে রাখা উচিত যে, তারা যা করছে এর কোনটাই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তার প্রাণপ্রিয় সাহাবাগণ ও তাবেঈদের কারো আদর্শ নয়। বরং তাদের অবস্থাতো এমন ছিলো, তারা যদি খাদ্য না পেতেন তাহলে ক্ষুধার্ত থাকতেন, আর খাদ্য উপস্থিত হলে সামনে যা পেতেন তা ভক্ষণ করে ক্ষুধার জ্বালা নিবারণ করতেন। আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামতো গোস্ত খেতেন এবং তা পসন্দও করতেন। তিনি মুরগির গোস্ত খেতেন এবং রানের গোস্ত পসন্দ করতেন। তার জন্য সুমিষ্ট ঠান্ডাপানি সংগ্রহ করা হতো, তবে তিনি বাসিপানি পসন্দ করতেন, কেননা প্রবহমান তাজা পানি পাকস্থলিকে পীড়া দেয় এবং পানির তৃষ্ণা নিবারণে তা ভালো সহায়কও নয়।

হাসান বসরীর (রহ.) যুগে এক ব্যক্তি বলতো যে, আমি খাবিস (খেজুর ও ঘি মিশ্রিত করে তৈরী একপ্রকার মিষ্টান্ন) খাবো না, কেননা

তার কৃতজ্ঞতা আদায় আমার দ্বারা সম্ভব নয়। একথা শ্রবণে হাসান বসরী (রহ.) বললেন, এতো এক নির্বোধ লোক; খাবিসতো দূরের কথা, ঠান্ডা পানির কৃতজ্ঞতা আদায় কী তার পক্ষে সম্ভব!

আমাদের পূর্বসূরি বুযুর্গরাতো মহল্লায় অবস্থানকালে এবং সফর-ভ্রমণেও উন্নতমানের খাবার খেতেন। বিখ্যাত বুযুর্গ সুফিয়ান ছাওরী যখন সফর করতেন, সফরের খাবার হিসাবে ভুনা গোস্ত ও ফালুদা সাথে নিতেন।

মানুষের জেনে রাখা উচিত যে, পরকাল নামক গন্তব্যে পৌছার জন্য দেহ হচ্ছে তার একমাত্র বাহন, সুতরাং তার সাথে কোমলতা প্রদর্শন মানুষের নৈতিক দায়িত্ব, যেন তার মাধ্যমে উদ্দিষ্ট গন্তব্যে শান্তি-নিরাপত্তার সাথে পৌছা যায়। তাই দেহের চাহিদা মোতাবেক উপকারী খাবার গ্রহণ করা এবং দেহের জন্য ক্ষতিকর সব ধরনের খাবার বর্জন করাই দুনিয়া ও আখেরাতে মানুষের জন্য কল্যাণকর। তবে উদর পূর্ণ করে তৃপ্তিসহকারে খাদ্যগ্রহণ থেকে নিজেকে বিরত রাখা উচিত, কেননা তা দেহ-মন ও দীন-ধর্মের জন্য ক্ষতিকর।

অবশ্য মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি বিভিন্ন রকম। তাই আরব বেদুঈনরা যদি পশমীপোষাক পরিধান করে এবং খাদ্যহিসাবে দুধপানের উপর সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে আমরা তাদের নিন্দা করবো না, কেননা তাদের দেহ-মন তা ধারণ করতে সক্ষম। অনুরূপভাবে আরব গ্রামবাসী যদি পশমীপোষাক পরিধান করে এবং শুধুমাত্র আচারকে খাদ্যহিসাবে গ্রহণ করে তাহলেও আমরা তাদের নিন্দা করবো না, এবং তাদের ব্যাপারে এ কথা বলবো না যে, তারা এমন পোষাক পরিধান ও এমন খাদ্য গ্রহণে নিজেদেরকে বাধ্য করেছে যা তাদের জন্য ক্ষতিকর ও কষ্টদায়ক, কেননা তারা যা করছে তা তাদের চিরাচরিত অভ্যাস।

পক্ষান্তরে দেহ যদি বিলাসিতাপূর্ণ হয়, যা প্রতিপালিত হয়েছে বিলাসিতার উপর তাহলে সেই ব্যক্তিকে আমরা এমন বিষয় নিজের উপর চাপাতে নিষেধ করবো যা তার জন্য কষ্টদায়ক। যদি সে কাম্যবস্তুগ্রহণে অনাগ্রহ প্রকাশ করে প্রবৃত্তির চাহিদা বর্জনকে এ ভেবে প্রাধান্য দেয় যে, হালাল বস্তু গ্রহণের ক্ষেত্রে অপচয়ের সম্ভাবনা রয়েছে, যা শরীয়তে বৈধ নয়; কিংবা সুস্বাদু খাবার উদর পূর্ণকরে খেতে বাধ্য করে, শরীয়তে যা প্রশংসিত নয়। কেননা উদর পূর্ণকরে খাদ্যগ্রহণে ঘুমের প্রবণতা বৃদ্ধিপায় এবং অলসতা ঘণীভূত হয়।

প্রথমেই এসব লোকদের জানা উচিত যে, কোন্ ধরনের খাদ্য বর্জন স্বাস্থের জন্য ক্ষতিকর আর কোনটি বর্জন ক্ষতিকর নয়। তাই যে ধরনের খাদ্য হতে নিজেকে বিরত রাখা স্বাস্থের জন্য ক্ষতিকর তা থেকে ঐ পরিমাণ গ্রহণ করবে যা দ্বারা দেহ সবল থাকে। তবে এত অধিক গ্রহণে নিজেকে বিরত রাখবে যা সুস্থতার পরিবর্তে অসুস্থতার কারণ হয়।

আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেন, এক সম্প্রদায় এমনও আছে, যারা মনে করে যে, প্রয়োজন-পরিমাণ খাদ্য হিসাবে সালন বিহীন শুকনো রুটিই যথেষ্ট। তাদের জেনে রাখা উচিত যে, প্রয়োজন-পরিমাণ খাদ্য হিসাবে সালন বিহীন শুকনো রুটি যদিও যথেষ্ট, তবে এর উপর সীমাবদ্ধ থাকা স্বাস্থের জন্য ক্ষতিকর। কেননা মানুষের দেহরস টক-মিষ্টি, ঠান্ডা-গরম, তরলতা ও কঠিনতার মুখাপেক্ষী এবং মানুষের দেহ সুস্থ থাকার ক্ষেত্রে এগুলো এক একটি বিশেষ উপাদান।

উদাহরণ স্বরুপঃ- যদি কারো কফ শুকিয়ে যায় তাহলে দেহ দুধ পানের মুখাপেক্ষী হবে। কেননা দেহ-মন সবল রাখতে কফের অবদান অপরিসীম। আর কারো পিত্ত বেড়ে গেলে দেহ টকের চাহিদা অনুভব করবে। সুতরাং দেহ সবল থাকতে মানুষের দেহরস যেসব

খাবারের মুখাপেক্ষী যদি এসব খাবার গ্রহণে কেউ নিজেকে বিরত রাখে তাহলে দেহ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অবশ্য উদর পূর্ণকরে তৃপ্তিসহকারে খাদ্যগ্রহণ, লোভ-লালসার বশীভূত হয়ে বিনা প্রয়োজনে খাবার আস্বাদন এবং যে খাদ্যগ্রহণ স্বাস্থের জন্য ক্ষতিকর তা থেকে নিজেকে বিরত রাখার বিষয়টি ভিন্ন।

তবে শুধু শুকনো রুটিকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে বাকি সব ধরনের খাবার থেকে নিজেকে বিরত রাখার সিদ্ধান্ত একটি ভুল সিদ্ধান্ত। সুতরাং এ বিষয়টি ভালোভাবে বুঝে নিন।

তবে সাবধান! হারেছ মুহাছেবী ও আবু তালেব মক্কীর ব্যাপারে যা বর্ণিত হয়েছে[১]তার অনুসরণ থেকে নিজেকে বিরত রাখুন। কেননা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাহাবাদের অনুসরণই উত্তম অনুসরণ।

জাহেদদেরকে শয়তান নেক সুরতে ধোঁকাদানের আরেক পদ্ধতি হলো, সে তাদের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল করে যে, নিম্নমানের খাবার ও পোষাক-পরিচ্ছদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকার নামই দুনিয়া বিমুখতা। ফলে তারা এসব নিয়েই সন্তুষ্টি প্রকাশ করে, অথচ তাদের দিল নেতৃত্ব ও খ্যাতিলাভের প্রতি আকৃষ্ট। ফলে দেখা যায় যে, তারা একান্তভাবে রাজা-বাদশাহ ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাতের অপেক্ষায় থাকে। ধনীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, আর দরিদ্রদেরকে উপেক্ষা করে। মানুষের উপস্থিতিতে বিনয়ের এমন ভান করে, যেন সবেমাত্র খোদার দর্শন থেকে বের হয়েছে।

তাদের কেউ এমনও আছেন, যারা মানুষের হাদিয়া ফিরিয়ে দেন, যেন এ কথা কেউ না বলে যে, এ ব্যক্তির দুনিয়া বিমুখতা খতম

[১] তাদের ব্যাপারে বর্ণিত রয়েছে যে, তারা বৈধ ভোগসামগ্রী বর্জন করে নফসের সাধনায় নিজেকে আত্মনিয়োগ করেছেন

হয়েছে, সে এখন দুনিয়ার ভোগ-বিলাসিতায় আসক্ত। তাদের ভাব-গাম্ভীর্যতায় অভিভূত হয়ে মানুষ তাদের সামনে বিনয়াবনত হয় এবং শ্রদ্ধায় বশিভূত হয়ে তাদের হাত চুম্বন করে। আর ক্রমান্বয়ে তাদের দিলে এ ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, আমরা যা করছি তা আল্লাহর নিকট পসন্দনীয় বলেই মানুষ আমাদের প্রতি আসক্ত। তাদের জেনে রাখা উচিত যে, খ্যাতিলাভ ও নেতৃত্বলাভের আশা-আকাঙ্খাতো দুনিয়াদারী মনোভাব। কেননা নেতৃত্বই দুনিয়াদারের মূল উদ্দেশ্য।

মানুষকে নেক সুরতে ধোঁকাদেয়ার ক্ষেত্রে যত পদ্ধতি শয়তান অবলম্বন করে সুপ্তরিয়া তার সর্বাধিক কার্যকর পদ্ধতি। আর প্রকাশ্য রিয়া শয়তানের নেক সুরতে ধোঁকার প্রকারসমূহের অন্তর্ভূক্ত নয়। উদাহরণস্বরূপঃ- দেহের শীর্ণতা ও চেহারার হরিদ্রাবর্ণ প্রকাশ করা এবং চুল এলোমেলো রাখা, যেন মানুষ মনে করে যে, এ ব্যক্তি দুনিয়া বিমুখ। অনুরুপভাবে বিনয় প্রকাশের উদ্দেশ্যে ক্ষীণ আওয়াজে কথা বলা, লোকদেখানোর উদ্দেশ্যে নামাজ পড়া ও সদকা করা – এ সবগুলোই প্রকাশ্য রিয়ার অন্তভূক্ত, যা কারো নিকট অস্পষ্ট নয়। এ বিষয়ে আলোকপাত এখানে আমাদের উদ্দেশ্য নয়, আমাদের আলোচনা হচ্ছে সুপ্ত রিয়ার বিষয়ে। যে দিকে ইঙ্গিত করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, إنما الأعمال بالنيات আমলের প্রতিদান নিয়্যাতের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং আমলের উদ্দেশ্য যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন না হয়, তাহলে আল্লাহর নিকট তা অগ্রহণযোগ্য।

মালেক বিন দীনার বলেন, এবাদত-বন্দেগীতে যার উদ্দেশ্য সৎ নয় তাকে বলে দাও, অযথা পরিশ্রম করে দেহ ক্লান্ত করো না।

আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেন, মুমিন আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের

উদ্দেশ্যেই আমল করে। তবে এবাদতকালে সুপ্তরিয়া তার দীলে প্রবেশ করে এখলাছ নষ্ট করে দেয়। এ সুপ্তরিয়া থেকে পরিত্রাণ পাওয়া কঠিন।

ইয়াসার বলেন, আমাকে ইউসুফ বিন আসবাত বলেন, تعلموا صحة العمل من سقمه فانى تعلمته فى اثنتين وعشرين سنة অর্থঃ তোমরা অসুস্থ আমল পরিহার করে সুস্থ আমল শিখ, কেননা বাইশ বছর সাধনা করে আমি তা শিখেছি।

ইবরাহিম বিন আদহাম বলেন, আমি সুমআন নামক জনৈক রাহেব থেকে মারেফত শিখেছি। আমি একদিন তার গির্জায় প্রবেশ করে বললাম হে সুমআন, আপনি কতদিন যাবত এ গির্জায় অবস্থান করছেন? তিনি বললেন, সত্তর বছর যাবৎ। আমি বললাম, আপনার খাবার কি? তিনি বললেন হে একনিষ্ঠ বন্ধু, কি প্রয়োজনে তুমি তা জানতে চাচ্ছো? আমি বললাম, জানতে আমার মন চায়। তিনি বললেন, প্রতিরাতে একটি মটরশুঁটি। আমি বললাম, খাদ্য হিসাবে এক মটরশুঁটির উপর সীমাবদ্ধ থাকতে কোন জিনিস আপনাকে প্ররোচিত করলো? তিনি বললেন, তুমি কী সম্মুখে কাউকে দেখছো? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, এরা বছরে একদিন আমার নিকট এসে আমার গির্জা সজ্জিত করে তার চতুর্পাশ তাওয়াফ করে খাদ্যহিসাবে দিনে একটি মটরশুঁটির উপর তুষ্ট থাকার কারণে আমার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। এবাদতে আমার দেহ যখন ক্লান্ত হয় তখন মনকে আমার সম্মানজনক এ মুহূর্তের কথা স্বরণ করালে দেহের ক্লান্তি দূরীভূত হয়। আমি একদিনের সম্মান লাভের জন্য এক বছরের কষ্ট সহ্য করি। সুতরাং হে আমার একনিষ্ঠ বন্ধু, তুমি চিরকালের শান্তি লাভের জন্য কিছু দিনের কষ্ট বরদাশ্‌ত করো। ইবরাহিম বিন

আদহাম বলেন, রাহেবের এ কথা শ্রবণে আমার দিলে মারেফত বদ্ধমূল হলো। তিনি বললেন, আমি কি আরো কিছু তোমাকে বলবো? আমি বললাম, হাঁ, বলুন। তিনি বললেন, তুমি গির্জা থেকে নিচে অবতরণ করো। আমি তখন গির্জা থেকে নেমে আসলে তিনি একটি ছোট বালতি আমার দিকে নামিয়ে দেন, যাতে বিশটি মটরশুঁটি ছিলো। তিনি আমাকে বললেন, তুমি গির্জায় প্রবেশ করো। আমি তোমার দিকে যা নামিয়ে দিয়েছি আগত লোকেরা তা দেখেছে। আমি গির্জায় প্রবেশ করলে তারা আমার চারপাশে সমবেত হয়ে বললো হে বন্ধু, শায়খ তোমাকে কী দিয়েছেন? আমি বললাম, তার দৈনিক খাবারের কিছু অংশ আমাকে দিয়েছেন। তারা বললো, তুমি তা দিয়ে কী করবে? আমরাই তার বেশী হক্বদার। তুমি মূল্য নির্ধারণ করো, আমরা তা কিনে নিব। আমি বললাম, বিশ দীনারের বিনিময়ে আমি তা বিক্রি করতে পারি। তখন বিশ দীনার দিয়ে তারা আমার থেকে তা কিনে নেয়। আমি তখন রাহেবের নিকট ফিরে গেলে তিনি আমাকে বললেন, তুমি ভুল করেছো। তুমি তার মূল্য যদি বিশ হাজার দীনার নির্ণয় করতে তাহলে অবশ্যই তারা তোমাকে তা দিত।

এতো ঐ ব্যক্তির মর্যাদা যে তার এবাদত করে না, তাহলে ভেবে দেখ, তুমি যার এবাদত করছো তার মর্যাদায় তুমি কিরূপ মর্যাদাবান হবে! সুতরাং হে বন্ধু, তুমি তোমার রবের এবাদতে মনোনিবেশ করো।

আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেন, রিয়ার ভয়ে সৎ লোকেরা আমল গোপন করতেন।

ইবনে সীরিন দিনে হাসতেন আর রাতে কাঁদতেন।

ইবরাহিম বিন আদহাম যখন অসুস্থ হতেন, তখন তার নিকট এমন খাবার দেখা যেত যা সুস্থ লোকেরা ভক্ষণ করে।

ওহাব বিন মুনাব্বিহ বলেন, এক ব্যক্তি স্বীয় যামানায় শ্রেষ্ঠ বুজুর্গ ছিলেন। লোকেরা তার সাক্ষাতে আসলে তিনি তাদেরকে নসিহত করতেন। একদিন বহুসংখ্যক লোক তার নিকট সমবেত হলে তিনি তাদেরকে বললেন, আমরা স্বেচ্ছাচারিতার ভয়ে দুনিয়ার বেড়াজাল থেকে বের হয়েছি এবং পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ থেকে পৃথক হয়েছি। কিন্তু এখন আমার আশঙ্কা হচ্ছে, মালদারেরা ধন-সম্পদের ক্ষেত্রে যেরুপ স্বেচ্ছাচারী হয় তার চে' অধিক স্বেচ্ছাচারিতা আমাদের মাঝে প্রবেশ করেছে। কেননা আমি দেখছি যে, আমাদের প্রত্যেকেই নিজ প্রয়োজন পুরা হওয়া এবং দীনদারিতে প্রসিদ্ধ হওয়ার দরুন পণ্য ক্রয়ের সময় বিক্রেতার ঘনিষ্ঠ হওয়া পসন্দ করে, কারো সাথে সাক্ষাৎ করলে কিংবা কেউ তার সাক্ষাতে এলে তার থেকে অভিবাদন পাওয়ার আশা করে এবং দীনদারিতায় উঁচু মাকাম অর্জন হওয়ায় নিজেকে সম্মানিত মনে করে। তার এ নসিহত চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো। এক পর্যায়ে বাদশাহর কানে তা পৌছলে বাদশাহ অত্যন্ত মুগ্ধ হন। তাকে সালাম দিয়ে এক পলক দেখার উদ্দেশ্যে বাদশাহ বাহনে আরোহণ করে তার দরবারে পৌছলে এক লোক তাকে বললো, আপনাকে সালাম দেয়ার উদ্দেশ্যে বাদশাহ আপনার নিকট এসেছেন। তিনি বললেন, সালাম দেয়ার পর বাদশাহ কী করবেন? সে বললো, যে নসিহত আপনি করেছেন তা আপনার জবান থেকে শ্রবণ করবেন। তিনি তখন খাদেমকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে কোন খাবার আছে? সে বললো, আপনি গাছের যে ফল দিয়ে ইফতার করতেন তা থেকে কয়েকটি ফল আছে। তিনি ফল উপস্থিত করার নির্দেশ দিলে খাদেম তা উপস্থিত করে তার সামনে পেশ করলে তিনি তা থেকে ভক্ষণ করা শুরু করেন। অথচ তিনি ছিলেন রোজাদার এবং সর্বদা রোজা রাখা ছিলো তার অভ্যাস। ইত্যবসরে বাদশাহ তার দরজায় উপস্থিত হয়ে তাকে সালাম দিলে তিনি ক্ষীণ আওয়াজে

সালামের উত্তর দেন। বাদশাহ্ তাকে ফল খেতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন,. লোকটি কোথায়? লোকেরা বললো, ইনিই সেই ব্যক্তি। বাদশাহ্ বললেন, যাকে খেতে দেখছি ইনি কী সেই ব্যক্তি? লোকেরা বললো, হাঁ। বাদশাহ্ বললেন, তাহলেতো এর মাঝে কোন কল্যাণ নেই। অতঃপর বাদশাহ্ তথা হইতে প্রস্থান করে রাজ ভবনে ফিরে আসেন। বাদশাহ্ চলে আসার পর লোকটি বললো, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমা হইতে তোমাকে বিমুখ করেছেন।

ঘটনাটি অন্য রেওয়ায়েতে এভাবে এসেছে, ওহাব বিন মুনাব্বিহ বলেন, বাদশাহ্ আগমন করলে লোকটি খাবার উপস্থিত করে শাক-সবজি দিয়ে এক বড় লোকমা তৈয়ার করে তেলের ভিতর তা চুবিয়ে জোর খাটিয়ে খাওয়া শুরু করলে বাদশাহ্ বললেন, হে লোক, তুমি কেমন বলোতো! সে বললো, আমি সাধারণ মানুষের মতই, আমার বিশেষ কোন বৈশিষ্ট নেই। বাদশাহ্ তখন ঘোড়ার লাগাম ঘুরিয়ে বললেন, এর মাঝে কোন কল্যাণ নেই। বাদশাহ্ চলে আসার পর লোকটি বললো, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি তাকে আমা হইতে বিমুখ করেছেন এমতাবস্থায় যে, সে আমাকে তিরস্কার করছে।

আতা বলেন, ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিক ইয়াযিদ বিন মারছাদকে গভর্নরের দায়িত্ব দিতে চেয়েছিলেন। ইয়াযিদের নিকট এ সংবাদ পৌছলে তিনি একটি পশমযুক্ত চামড়া গায়ে জড়ালেন। চামড়াটির পশমমুক্ত অংশ ছিলো গায়ের সাথে, আর পশমযুক্ত অংশ ছিলো দেহের বহিরাংশে। অতঃপর হাতে একটুকরো রুটি ও গোস্তবিহীন হাড় নিয়ে চাদর, টুপি, জোতা ও মুজা পরিধান করা ব্যতীত বাজারে হেঁটে হেঁটে তা খেতে লাগলেন। তখন ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিককে বলা হলো, ইয়াযিদ বিন মারছাদেরতো আকল বিলুপ্ত হয়েছে। অতঃপর ইয়াযিদের আচরণ তার সামনে বর্ণিত হলে তাকে গভর্নর নিযুক্ত করার চিন্তা পরিহার করেন। এরুপ বহু দৃষ্টান্ত ইতিহাসের পাতায় বিদ্যমান।

জাহেদদের কতক এমনও আছেন, যারা প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য উভয় হালতে দুনিয়ার ভোগবিলাস থেকে বিরত থাকেন। কিন্তু তাদের অবস্থা হলো, তারা সাথী-সঙ্গী ও পরিবারের নিকট দুনিয়া বিমুখতার বিষয়টি আলোচনা করা অপরিহার্য মনে করেন, যেন দুনিয়ার ভোগবিলাসে নির্লিপ্ত থাকা তাদের জন্য সহজতর হয়। যেমনটি সহজতর হয়েছিলো ইবরাহিম বিন আদহামের সাথে আলোচিত রাহেবের উপর। দুনিয়া বিমুখতায় যদি তার উদ্দেশ্য একনিষ্ঠ হতো তাহলে সে সাথী-সঙ্গী ও পরিবারের সাথে এ পরিমাণ আহার করতো যা দ্বারা নফসের প্রভাব নিয়ন্ত্রিত হয় এবং তার দুনিয়া বিমুখতার আলোচনা বিলুপ্ত হয়।

দাউদ বিন আবু হিনদের ঘটনাতো এমন, তিনি লাগাতার বিশ বছর রোজা রেখেছেন, অথচ ঘরের কেউ জানতেন না যে তিনি রোজাদার। তিনি ঘর থেকে খাবার নিয়ে বাজারে যাওয়ার পথেই তা সদকা করে দিতেন। ফলে বাজারবাসী ধারণা করতো সে ঘরে খেয়েছে আর ঘরবাসী ধারণা করতো সে বাজারে খেয়েছে। এমনই ছিলেন আমাদের পূর্বসূরি আকাবিরগণ।

জাহেদদের কতক এমনও আছেন, নিরবচ্ছিন্নভাবে মসজিদে পড়ে থাকা এবং নিঃসঙ্গবস্থায় পাহাড়ে অবস্থান করাই যাদের দৈনিক খাদ্য, তাদের নিঃসঙ্গতার কথা মানুষ জানুক এতেই তাদের তৃপ্তি। আবার কখনো সে নিঃসঙ্গ থাকার দলীল পেশ করে বলে, আমার আশঙ্কা হয় যে, লোকালয়ে থাকলে মানুষ আমার গুনাহ বর্জনের বিষয়ে অবগত হবে। অথচ এসব কথা সে বিভিন্ন উদ্দেশ্যমূলক বলে। তার উদ্দেশ্যসমূহের কয়েকটি হলোঃ- নিজের বড়ত্ব প্রকাশ করা, মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান করা, খেদমতলাভের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ার আশঙ্কা করা, তার রীতিনীতি ও নেতৃত্ব রক্ষা করা। আর মানুষের সংস্পর্শে এসবের অর্জন অসম্ভব। অথচ তারতো আশা তার প্রশংসা ও আলোচনা স্থায়িত্ব লাভ করুক।

আর কখনো তার উদ্দেশ্য হয় নিজ দোষ-ত্রুটি, মন্দস্বভাব ও ইলম

সম্পর্কে অজ্ঞতার বিষয়টি জনগণ থেকে গোপন রাখা, তাই সে উপায়ান্তর না পেয়ে এ পন্থা অবলম্বন করে। তার সাথে মানুষ সাক্ষাৎ করুক এটা সে পসন্দ করে কিন্তু সে কারো সাক্ষাতে গমন করে না। তার দরবারে আমির-ওমারাদের আগমন, দরজায় জনসাধারণের সমবেত হওয়া এবং তারা তার হাত চুম্বন করায় সে আনন্দিত হয়, অথচ রুগি দেখা ও জানাযায় শরীক হওয়া সে পরিহার করে। এ ব্যক্তি যদি খাদ্য গ্রহণের মুখাপেক্ষী হয় এবং তাকে খাবার কিনে দেয়ার মত কাউকে সে না পায় তাহলে সে ক্ষুধার উপর সবর করে, যেন খাবার কিনতে নিজেকে বাজারে যেতে না হয়, কেননা মানুষের সাথে বাজারে হাঁটলে যশ-খ্যাতি নষ্ট হবে। তার চিন্তা-চেতনা এমন, যদি বাজারে গিয়ে প্রয়োজনিয় পণ্য খরিদ করি তাহলে প্রসিদ্ধি খতম হবে। কোন সন্দেহ নেই যে, নিজের উদ্ভাবিত রীতিনীতি রক্ষার উদ্দেশ্য এ ব্যক্তির মনে বিদ্যমান। অথচ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাজারে গিয়ে প্রয়োজনীয় পণ্য খরিদ করতেন এবং নিজে বহন করে তা বাড়িতে নিয়ে আসতেন। রাসুলের সাহাবী আবু বকর (রা.) বিক্রির উদ্দেশ্যে কাঁধে কাপড় বহন করে বাজারে নিতেন এবং প্রয়োজনীয় পণ্য খরিদ করে বাড়ি ফিরতেন।

আবদুল্লাহ বিন হানযালা বলেন, আবদুল্লাহ বিন সালাম (রা.) মাথায় লাকড়ির আঁটি বহন করে রাস্তায় পথ চললে লোকেরা তাকে বললো হে আবদুল্লাহ, কোন জিনিস তোমাকে এ কাজে বাধ্য করলো? অথচ আল্লাহ তোমাকে সম্পদ দিয়েছেন! তিনি বললেন, আমি এর মাধ্যমে অহঙ্কার দূর করছি। কেননা আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, لا يدخل الجنة عبد فى قلبه مثقال ذرة من الكبر। অর্থঃ এমন বান্দা জান্নাতে প্রবেশ করবেনা, যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অহঙ্কার রয়েছে।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, প্রয়োজনীয় পণ্য ক্রয়ের উদ্দেশ্যে বাজারে যাওয়া এবং নিজেকে বিলিয়ে দেয়ার যে উদাহরণ আমরা উল্লেখ করেছি তা ছিলো আমাদের পূর্বসূরিদের অভ্যাস। অবশ্য সে অভ্যাস এখন পরিবর্তন হয়েছে যেভাবে পরিবেশ ও পোষাক-পরিচ্ছদ পরিবর্তিত হয়েছে। তাই আলেমের জন্য প্রয়োজনীয় পণ্য ক্রয়ের উদ্দেশ্যে বাজারে যাওয়া আমি এখন উত্তম মনে করি না। কেননা আলেমের এ আচরণ বর্তমানে মূর্খদের অন্তরে ইলমের মর্যাদা কমিয়ে দেয়। অথচ ইলমের মর্যাদা মানুষের দীলে বিদ্যমান থাকা শরীয়ত সম্মত বিষয়। আর যে জিনিস তাদের অন্তরে ইলমের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা বৃদ্ধি করে তা অবলম্বন করা শরীয়তে নিষিদ্ধ নয়। আর পূর্বসূরিদের যে আচরণ মানুষের দিলে পরিবর্তন আনতোনা, বর্তমানেও তা পালন করা আবশ্যক নয়। ইমাম আওযায়ী বলেন, আমরা হাসাহাসি ও উপহাস করতাম, যখন মানুষ আমাদের অনুসরণ শুরু করলো তখন নিজেদের জন্য আমরা তা অবৈধ মনে করলাম।

ইবরাহিম বিন আদহামের সাথীরা একদিন রসিকতা করছিলো, তখন এক লোক দরজায় কড়া নেড়ে তাদেরকে চুপ থাকার নির্দেশ দিলে তারা বললো, আমরা রিয়া শিখেছি। তখন সে তাদেরকে বললো, তোমাদের মাঝে আল্লাহর নাফরমানি হওয়া আমি অপসন্দ করি।

জাহেদদের কিছু সংখ্যক এমনও আছেন, তাদেরকে যদি মসৃণ পোষাক পরিধান করতে বলা হয় তারা কিছুতেই তা পরিধান করবেন না, যেন দুনিয়া বিমুখতায় তাদের খ্যাতি-সুখ্যাতি হ্রাস না পায়। আর তাদেরকে যদি মানুষের উপস্থিতিতে খাবার গ্রহণের আবদার করা হয় তাহলে দেহ থেকে প্রাণবায়ু বের হয়ে গেলেও তারা মানুষের সামনে খাদ্য গ্রহণ করবেন না। তারা হাসি চাপিয়ে রেখে মানুষের সামনে মুচকি হাসেন, আর ইবলিস তাদের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল করে যে, তুমি যা করছো তার উদ্দেশ্যতো মানুষের সংশোধন, অথচ প্রকারান্তরে তা এমন রিয়া যা

দ্বারা তার নব আবিষ্কৃত রীতিনীতি সংরক্ষণ করা হয়।

আপনি তাকে দেখবেন তার মাথা সর্বদা অবনমিত, দুঃখের ছাপ তার চেহারায় সদা পরিস্ফুট, যেন সে পরকাল চিন্তায় বিভোর; অথচ মানুষ চলে গেলে তার আচার-ব্যবহারে মনে হবে সে যেন এক হিংস্র সিংহ।

জাহেদদের কতক এমনও আছেন, তার কাপড় যদি ছিঁড়ে যায় সে তা সিলাই করে না, পাগড়ি যদি নষ্ট হয় সে তা সংশোধন করে না, দাড়ি যদি এলোমেলো হয় সে তা আঁচড়ায় না। সে এসব আচরণ দ্বারা মানুষকে বুঝাতে চায়, দুনিয়ার কোন বস্তু তার নিকট উত্তম নয়। অথচ সে যা করছে তাতো এক প্রকার রিয়া। আর দুনিয়া বিমুখতার এ পদ্ধতি যদি সে সঠিক মনে করে, 'যেমন দাউদ তাঈকে যখন বলা হলো, আপনি কি দাড়ি আঁচড়াবেন না? তিনি উত্তরে বললেন, আখেরাতের ব্যস্ত তার দরুন তা আঁচড়ানোর সময় কোথায়!' তাহলে তার জেনে রাখা উচিত, তার এ পদ্ধতি সঠিক নয়। কেননা এ পদ্ধতি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাহাবাদের কেউ অবলম্বন করেন নি। বরং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামতো চুল আঁচড়াতেন, আয়নায় চেহারা দেখতেন, মাথায় তেল ব্যবহার করতেন এবং শরীরে আতর লাগাতেন; অথচ আখেরাতের বিষয়ে তিনি ছিলেন সর্বাধিক ব্যস্ত। নবীর সাহাবী আবু বকর ও ওমর (রা.) মেহেদী দ্বারা দাড়ি খেযাব করতেন, অথচ তারা ছিলেন সর্বাধিক মুত্তাকী ও দুনিয়া বিমুখ সাহাবী। সুতরাং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাহাবীদের উপর কোন গুণ ও বৈশিষ্টের দাবি যদি কেউ করে তাহলে সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করা হবেনা।

জাহেদদের কতক এমনও আছেন, যারা সর্বদা চুপ থাকেন এবং পরিবারের সংস্পর্শ হতে বিরত থেকে নিঃসঙ্গ জীবন অতিবাহন করেন। ফলে সে মন্দ স্বভাব ও পরিবারের প্রতি বিষন্নভাবাপন্ন হয়ে তাদেরকে কষ্টে নিপতিত করে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া

সাল্লামের 'إن لأهلك عليك حقا' অর্থঃ নিশ্চয় তোমার উপর রয়েছে তোমার স্ত্রীর হক্ব' এ কথাকে ভুলে যায়। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামতো মজাক করে শিশুদের সাথে খেলা করতেন, স্ত্রীদের সাথে আলাপ করতেন এবং স্ত্রী আয়েশার (রা.) সাথে দৌর প্রতিযোগিতা করেছেন। হাদীসের অগণিত পাতায় বিদ্যমান রয়েছে এ জাতীয় কোমল আচরণের বহু উদাহরণ।

এ জাতীয় জাহেদরা মন্দ স্বভাব ও পরিবার হতে পৃথক থেকে সন্তানকে বানায় এতিমের ন্যায় আর স্ত্রীকে বানায় বিধবার ন্যায়। এসবের একমাত্র কারণ, সে মনে করে যে, পরিবারের প্রতি খেয়াল রাখা আখেরাত থেকে বিমুখ করে। অথচ জ্ঞান স্বল্পতার দরুন তাদের জানা নেই যে, পরিবারের প্রতি উদারহস্ত হয়ে তাদের সাথে আনন্দ করা আখেরাতের পথকে সুগম করে।

বুখারী মুসলিমের হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম জাবের (রা.) কে বলেছেন, هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك তুমি যদি কুমারী মেয়ে বিবাহ করতে, তাহলেতো সে তোমার সাথে আনন্দ করতো এবং তুমিও তার সাথে আনন্দ করতে।

আবার কখনো এ জাহেদের মনে শুষ্কদেহের অধিকারী হওয়ার চিন্তা প্রবল আকার ধারণ করে, ফলে সে স্ত্রী সহবাস বর্জন করে নফল আদায়ে ফরজ বরবাদ করে, শরীয়তে যার প্রশংসা অবিদ্যমান।

জাহেদদের কতক এমনও আছেন, যারা নিজ আমলে মুগ্ধ হন। তাকে যদি বলা হয়, আপনিতো যমিনের খুঁটি, (অর্থাৎ আপনার কারণেই পৃথিবী টিকে আছে) তাহলে সে তা সত্য মনে করে।

তাদের কতকের অবস্থা এমন, যারা নিজের থেকে কারামত প্রকাশের অপেক্ষায় থাকে এবং তার মনে এ ধারণা জন্মায় যে, সে যদি পানির নিকটবর্তী হয় তাহলে সে পানির উপর হাঁটতে সক্ষম হবে। যদি সে

বিপদের সম্মুখীন হয়ে দোয়া করে এবং সে দোয়ার ফলাফল তৎক্ষণাৎ না পায় তাহলে সে অসন্তুষ্ট হয়। যেন সে মজদুর, যে তার কাজের বিনিময় দাবি করছে। যদি তার প্রকৃত বুঝশক্তি থাকতো তাহলে সে বুঝতো যে, তার অবস্থান এক কৃতদাসের ন্যায়, আর কৃতদাস নিজ কাজের দ্বারা মনিবের উপর অনুগ্রহ ফলাতে পারে না। আর যদি সে ভেবে দেখতো যে, আল্লাহর তাওফীকেই আমি এ কাজ করতে পেরেছি, তাহলে সে আমল করতে পারায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশকে আবশ্যক ভেবে আমলে ত্রুটি-বিচ্যুতির ভয় করতো।

মানুষের অবস্থা এমন হওয়াই কাম্য, আমলে ত্রুটি-বিচ্যুতির ভয় তা কবুল হওয়ার ব্যাপারে মনকে পেরেশান রাখবে। রাবেয়া বসরী (রহ.) বলতেন যে, আমি কথায় সততার স্বল্পতার কারণে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাই। কেউ তাকে জিজ্ঞেস করে বললো, এমন কোন আমল কি আপনার আছে, যা কবুল হওয়ার ব্যাপারে আপনি আশাবাদী? তিনি উত্তরে বললেন, কোন কোন আমলের ব্যাপারে যদিও আশাবাদী, তবে তা কবুল না হওয়ার আশঙ্কাও আমার দীলে সদা জাগ্রত।

কতক জাহেদের অবস্থা এমন, জ্ঞান স্বল্পতার দরুন শয়তান যাদেরকে এমন কাজে উদ্বুদ্ধ করে শরীয়তে যা নিন্দনীয়, ফলে উদ্দেশ্য নেক হওয়া সত্ত্বেও সওয়াব লাভের পরিবর্তে সে হয় গুনাহের ভাগিদার। উদাহরণ স্বরূপঃ ইবনে আক্বীল বলেন, আবু ইসহাক্ব খাজ্জার ছিলেন এক সৎ বুযুর্গ। তিনি এমন ব্যক্তি যিনি আমাকে সর্ব প্রথম কোরআন শিখিয়েছেন। তার অভ্যাস ছিলো রমযান মাসে কথা বলা হতে বিরত থাকা। তাই কথা বলার প্রয়োজন হলে তিনি কোরআনের আয়াত দ্বারা সেদিকে ইশারা করতেন। যেমন কাউকে অনুমতি প্রদানকালে তিনি বলতেন, أدخلوا عليهم الباب বাজার করার জন্য ছেলেকে বলতেন, من بقلها وقثائها উদ্দেশ্য হলো, শাক-সবজি ক্রয়ের জন্য ছেলেকে আদেশ

করা। ইবনে আক্বীল বলেন, বিষয়টি জানতে পেরে আমি তাকে বললাম, আপনি এবাদত মনে করে যা করছেন তা মূলতঃ নাফরমানি। তখন আমার এ কথা মানতে তার কষ্ট হলে আমি তাকে বললাম, নিশ্চয় এ কোরআন শরীয়তের বিধি-বিধান বর্ণনার উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে, সুতরাং দুনিয়াবী প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে তা ব্যবহার করা উচিত নয়। আপনার এ কাজের উদাহরণতো কোরআনকে আপনার বালিশ হিসাবে ব্যবহার করার ন্যায়। তখন তিনি আমার দলীলের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে আমাকে ছেড়ে চলে যান।

জাহেদদের কতক এমনও আছেন, শরীয়তের বিধি-বিধান কম জানার কারণে তারা লোকমুখে যা শুনেন সে অনুযায়ী অন্যকে ফতোয়া দেন। ফক্বীহ আবু হাকিম ইবরাহীম বিন দীনারের নিকট এক লোক ফতোয়া চেয়ে বললো, আপনি এমন মহিলার ব্যাপারে কি বলেন, যাকে তার স্বামী তিন তালাক দেয়ার পর সে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করে; এ মহিলা কী তার স্বামীর জন্য হালাল হবে? তিনি বললেন, না। তখন শরীফ দুহালী নামে এক প্রসিদ্ধ জাহেদ তার নিকট উপস্থিত ছিলো, জনগণের মাঝে সে ছিলো বড় সম্মানিত ব্যক্তি। সে তখন ফক্বীহ আবু হাকেমকে বললো, আপনি এ কী ফতোয়া দিলেন! বরং এ মহিলা তার স্বামীর জন্য বৈধ হবে। আবু হাকেম বলেন, এরুপ ফতোয়াতো আজ পর্যন্ত কেউ দেয়নি। তখন শরীফ দুহালী বললো, আল্লাহর কসম; আমি এখান থেকে বসরা পর্যন্ত এ ফতোয়া দিয়েছি।

আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেন, দেখুন: অজ্ঞতা অজ্ঞ ব্যক্তির সাথে কিরুপ আচরণ করে, সে তাকে খ্যাতি রক্ষার ভয়ে না জানা বিষয়ে ফতোয়া দিতে উদ্বুদ্ধ করে, যেন মানুষ তাকে মূর্খজাহেদ না ভাবে। অথচ আমাদের পূর্বসূরী ওলামায়ে কেরাম জাহেদদেরকে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ফতোয়া দিতে নিষেধ করতেন। কেননা ফতোয়ার শর্তাবলি তাদের মাঝে বিদ্যমান নেই।

ইসমাঈল বিন শিব্বাহ বলেন, আমি আহমদ বিন হাম্বলের দরবারে উপস্থিত হলাম, ইত্যবসরে আহমদ বিন হারব মক্কা থেকে আগমন করলো। তখন আহমদ বিন হাম্বল আমাকে বললেন, খোরাসান থেকে আগত এ ব্যক্তি কে? আমি বললাম, ইনি একজন প্রসিদ্ধ জাহেদ ও পরহেজগার ব্যক্তি। তখন আহমদ বিন হাম্বল বললেন, যে নিজেকে জাহেদ বলে দাবি করে তার জন্য উচিত নয় নিজেকে ফতোয়ার কাজে নিযুক্ত করা।

জাহেদদেরকে শয়তান নেক সুরতে ধোঁকা দেয়ার আরেক পদ্ধতি হলো, তারা আলেমদেরকে তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখে এবং তাদের নিন্দা করে। তারা বলে, ইলমের উদ্দেশ্য আমল, সুতরাং যে আমল করে তার জন্য ইলমের প্রয়োজন নেই। অথচ তাদের জানা নেই যে, ইলম হচ্ছে অন্তরের নূর। শরীয়ত রক্ষায় আলেমের মর্যাদা তারা যদি জানতো, তাহলে নিজেকে ঐরূপ মনে করতো, বাকশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির সামনে বোবা ব্যক্তি এবং দৃষ্টিবানের সামনে দৃষ্টিহীন ব্যক্তি নিজেকে যেরূপ মনে করে। কেননা এ উম্মতের আলেমের মর্তবা একজন নবীর মতো।

আর আলেমরা হলেন পথ-প্রদর্শক, যাদের অনুসারী গোটা মানবজাতি। সাহল বিন সা'দ বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলী বিন আবী তালেবকে (রা.) বলেছেন, والله لأن يهدى الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم অর্থঃ আল্লাহর কসম: তোমার মাধ্যমে আল্লাহ এক ব্যক্তিকে হেদায়েত দেয়া তোমার জন্য লাল উষ্ট্রী লাভ হওয়া থেকে উত্তম।

জাহেদরা যেসব বিষয়ে আলেমদের নিন্দা করে তার একটি হলো, ইলম অর্জন ও শিক্ষাদানের নিমিত্তে শক্তিবর্ধক বৈধ খাবার গ্রহণকরা। অনুরূপভাবে তারা আলেমদের মাল জমা করার বিষয়েও নিন্দা করে।

তারা যদি বৈধতার সংজ্ঞা জানতো তাহলে বুঝতো যে, শরীয়ত বৈধকাজ সম্পাদনকারীর নিন্দা করেনা। বৈধতার বিষয়ে সর্বোচ্চ এতটুকু বলা যায়, তা পরিহার করে তাক্বওয়ার পথ অবলম্বন করা উত্তম। আচ্ছা বলুনতো, যে সারারাত নফল পড়েছে তার জন্য কী ঐ ব্যক্তির নিন্দা করা সমীচীন হবে, যে ফরজ আদায়ের পর সারারাত ঘুমিয়েছে?

একটি ঘটনা দ্বারা বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে। মুহাম্মদ বিন জা'ফর খাওলানী বলেন, আমার নিকট হাতেম আসামের শিষ্য আবু আবদুল্লাহ খাওয়াছ বলেছেন, আমরা হাতেম বলখীর সাথে রায় নগরীতে প্রবেশ করি। তার সাথে তার তিনশত বিশজন শিষ্য ছিলো। তারা হজ্জের উদ্দেশ্যে তার সাথে রওয়ানা হয়েছে। তাদের গায়ে ছিলো পশমী পোষাক। তাদের সাথে না ছিলো খাবার না ছিলো থলে। আমরা এক ধার্মিক ব্যবসায়ীর বাড়িতে যাত্রা বিরতি করলাম। ব্যবসায়ী সে রাত আমাদের মেহমানদারি করেছেন। পরদিন সকালে ব্যবসায়ী হাতেমকে বললো, হে আবু আবদুর রহমান! আমাদের এলাকার আলেম সাহেব অসুস্থ, আমি তাকে দেখতে যাচ্ছি। আপনার ইচ্ছা হলে আমার সাথে চলুন। তখন হাতেম বললো, তোমাদের আলেম যদি অসুস্থ হোন তাহলে তাকে দেখতে যাওয়াতো পূণ্যের কাজ, তদুপরি আলেমের দিকে তাকানো এবাদতও বটে। আমি তোমার সাথে যাবো।

অসুস্থ আলেমের নাম ছিলো মুহাম্মদ বিন মুক্বাতিল, যিনি রায় নগরীর বিচারক ছিলেন। তখন ব্যবসায়ী বললো, আপনি আদেশ করলে আমরা রওয়ানা হতে পারি। তারা আলেমের বাড়ির দরজায় পৌঁছলে দ্বাররক্ষীর সাথে দেখা হয়। আলেমের শানদার বাড়ি দেখে হাতেম চিন্তিত হয়ে বললো, হায় আল্লাহ! আলেমের বাড়ির এ অবস্থা! অনুমতি পেয়ে তারা বাড়ির ভিতর প্রবেশ করলো। হাতেম তাকিয়ে দেখলো বাড়িটি অত্যন্ত প্রশস্ত, তার আসবাবপত্র অত্যন্ত মূল্যবান, তার বিছানা অত্যন্ত কোমল এবং তার পর্দা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক।

হাতেম চিন্তিত মনে এসব দেখতে দেখতে মুহাম্মদ বিন মুক্বাতিলের মজলিসে প্রবেশ করে দেখলো যে, তিনি কোমল সুন্দর বিছানায় আরাম করছেন। কিছু লোক তার শিয়রে বসে বাতাস দিচ্ছে, আর কিছু লোক তার সাথে আলাপ করছে। অনুমতি পেয়ে ব্যবসায়ী উপবেশ গ্রহণ করলো কিন্তু হাতেম দাঁড়িয়ে রইলো। তখন মুহাম্মদ বিন মুক্বাতিল ইশারায় হাতেমকে বসতে বললে হাতেম বললো, আমি বসবো না। তখন মুহাম্মদ বিন মুক্বাতিল হাতেমকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কি কোন প্রয়োজন আছে? হাতেম বললো, হাঁ। মুহাম্মদ বিন মুক্বাতিল জিজ্ঞেস করলেন, কি সেই প্রয়োজন? হাতেম বললো, একটি বিষয় আপনার নিকট জানতে চাই। মুহাম্মদ বিন মুক্বাতিল বললেন, জিজ্ঞেস করুন। হাতেম বললো, আপনি আগে সোজা হয়ে বসুন, যেন আপনাকে জিজ্ঞেস করতে পারি। তখন মুহাম্মদ বিন মুক্বাতিল খাদেমদেরকে নির্দেশ দিলে তারা তাকে হেলান দিয়ে বসায়। হাতেম বললো, আপনি এলেম কোথা হইতে শিখেছেন? তিনি বললেন, নির্ভরযোগ্য ওলামাদের থেকে। হাতেম বললো, তারা কার থেকে শিখেছেন? তিনি বললেন, তাবেঈদের থেকে। হাতেম বললো, তাবেঈরা কার থেকে শিখেছেন? তিনি বললেন, রাসুলের সাহাবীদের থেকে। হাতেম বললো, রাসুলের সাহাবীরা কার থেকে শিখেছেন? তিনি বললেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে। হাতেম বললো, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা কোথা হইতে পেয়েছেন? তিনি বললেন, জিবরাঈল আলাইহিস সালাম থেকে, আর জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন থেকে।

হাতেম বললো, আচ্ছা জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আল্লাহর পক্ষ হতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট যা

কিছু পৌঁছিয়েছেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদের নিকট যা কিছু পৌঁছিয়েছেন এবং সাহাবারা তাবেঈদের নিকট যা কিছু পৌঁছিয়েছেন এবং তাবেঈরা নির্ভরযোগ্য ওলামাদের নিকট যা কিছু পৌঁছিয়েছেন এবং নির্ভরযোগ্য ওলামায়ে কেরাম আপনাদের নিকট যা কিছু পৌঁছিয়েছেন তার কোথাও কী এমন পেয়েছেন, দুনিয়াতে যার বাড়ি উত্তম হবে, যার বিছানা নরম হবে এবং যার ভোগসামগ্রী বেশি হবে আল্লাহর নিকট সে ব্যক্তি সর্বাধিক মর্যাদাবান হবে? সে উত্তরে বললো, না। হাতেম বললো, তাহলে কেমন পেয়েছেন? তিনি বললেন, বরং এভাবে পেয়েছি, যে দুনিয়ার ভোগ-বিলাসিতায় বিমুখ হবে, আখেরাতের বিষয়ে আগ্রহী হবে, মিসকীনদেরকে ভালোবাসবে এবং আখেরাতের জন্য সৎকাজ করবে সে হবে আল্লাহর নিকট মর্যাদাবান ও লাভ করবে আল্লাহর নৈকট্য।

হাতেম বললো, আপনি তাহলে কার অনুসরণ করেছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তার সাহাবায়ে কেরাম, তাদের অনুসারী তাবেঈগণ ও তাদের থেকে শিক্ষাগ্রহণকারী নির্ভরযোগ্য ওলামায়ে কেরামের, নাকি ফেরাউন ও নমরুদের? কেননা তারাই প্রথম মানুষ যারা সিমেন্ট-বালি ও চুনা-সুরকি দিয়ে এমারত নির্মাণ করেছে। হে নিকৃষ্ট আলেমের দল, দুনিয়াদার মূর্খমানবজাতি – যারা দুনিয়ার ভোগ-বিলাসিতায় কুকুরের ন্যায় লালায়িত, তারা যদি তোমাদের হালত দেখে তাহলে মনে সংকল্প করবে যে, এরূপ যদি হয় আলেমের বিলাসিতা তাহলেতো আমাকে আরো বিলাসী হতে হবে।

হাতেম এসব কথা বলে তার দরবার থেকে চলে আসে। হাতেমের কথা শুনে মুহাম্মদ বিন মুক্বাতিলের অসুস্থতা বেড়ে যায়।

হাতেম ও মুহাম্মদ বিন মুক্বাতিলের মাঝে চলমান আলোচনা রায় নগরীতে ছড়িয়ে পড়লে নগরবাসী হাতেমকে বললো, কাযবীনের বিখ্যাত আলেম মুহাম্মদ বিন ওবাইদ তনাফিসীতো তার চে' অধিক ধন-সম্পদের মালিক। তখন হাতেম তার সাক্ষাতে গিয়ে দেখেন, তিনি এক মজলিসে হাদীস বর্ণনা করছেন, আর লোকেরা মনোযোগের সহিত তার হাদীস শ্রবণ করছে।

হাতেম মুহাম্মদ বিন ওবাইদ তনাফিসীকে বললো, 'আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন' আমি একজন অনারবী লোক, দীনের প্রাথমিক শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে আমি আপনার নিকট এসেছি। আপনি কি আমাকে ওজু করার পদ্ধতি শিখাবেন? মুহাম্মদ বিন ওবাইদ তনাফিসী বললেন, হাঁ; অবশ্যই। তিনি এক খাদেমকে পানি আনার নির্দেশ দিলে খাদেম পানি উপস্থিত করে। তখন মুহাম্মদ বিন ওবাইদ তনাফিসী বসে ওজু করলেন এবং প্রতিটি অঙ্গ তিনবার করে ধৌত করলেন। অতঃপর বললেন, ওজু এভাবে করতে হয়।

হাতেম বললো, আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন; দয়া করে আপনার স্থানে বসে আমাকে অজু করার সুযোগ দিন, যেন আমার উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন অধিক সহজতর হয়।

তনাফিসী উঠে দাঁড়ালে হাতেম তার স্থানে বসে ওজু শুরু করলো। সে চেহারা তিনবার ধৌত করে বাহু চারবার ধুলে তনাফিসী বললো, আপনিতো অপচয় করেছেন। হাতেম বললো, কিভাবে অপচয় করলাম? তনাফিসী বললো, বাহু চারবার ধৌতকরার মাধ্যমে। হাতেম বললো, সুবহানাল্লাহ; একমুষ্টি পানি বেশি ব্যবহার করেই অপচয়কারী হয়ে গেলাম, আর আপনি এতসব ধন-সম্পদ ভোগকরেও অপচয়কারী নন! তনাফিসী বুঝে ফেললেন যে, এ ব্যক্তির শিক্ষালাভ উদ্দেশ্য নয়, বরং শিক্ষাদেয়া উদ্দেশ্য। অতঃপর তনাফিসী ঘরে প্রবেশ করে চল্লিশ দিন পর্যন্ত কারো সাথে সাক্ষাৎ করেন নি।

হাতেম হিজায হয়ে মদীনায় পৌঁছলে মদীনার আলেমদের সাথে ঝগড়া করার ইচ্ছা করলো। মদীনায় প্রবেশ করে হাতেম জিজ্ঞেস করলো, হে মদীনাবাসী! এটি কোন শহর? লোকেরা বললো, এটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের শহর। হাতেম বললো, তাহলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রাসাদ কোথায়? আমাকে তা দেখাবেন কি? যেন তাতে প্রবেশ করে আমি দু' রাকআত নামাজ পড়তে পারি। তারা বললো, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামেরতো কোন প্রাসাদ ছিলোনা। বরং তারতো কাদামাটির প্রলেপযুক্ত সাধারণ ঘর ছিলো। হাতেম বললো, তাহলে তার স্ত্রী-পরিবার ও সাথী-সঙ্গীদের প্রাসাদ কোথায়? তারা বললো, তাদেরতো কোন প্রাসাদ ছিলোনা। বরং তারাও কাদামাটির প্রলেপযুক্ত সাধারণ ঘরে বাস করতেন। হাতেম বললো, তাহলেতো এটা ফেরাউনের শহর।

তখন লোকেরা তাকে গালমন্দ করে গভর্নরের নিকট নিয়ে যায়। তারা অভিযোগ করে বললো, এই অনারবী লোক বলে এটা নাকি ফেরাউনের শহর।

গভর্নর জিজ্ঞেস করলেন, আপনি তা কেন বললেন? হাতেম বললো, গভর্নর সাহেব! আপনি আমার বিষয়ে তাড়াহুড়া করবেন না। আমি একজন মুসাফির লোক। আমি এ শহরে প্রবেশ করে জিজ্ঞেস করলাম, এটি কোন শহর? লোকেরা বললো, এটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের শহর। আমি তাদেরকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাহাবাদের প্রাসাদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তারা বললো, তাদেরতো কোন প্রাসাদ ছিলোনা, তারাতো কাদামাটির প্রলেপযুক্ত সাধারণ ঘরে বাস করতেন। অথচ আল্লাহ তায়ালা কোরআনে বলেছেন, لقد كان لكم في

رسول الله أسوة حسنة, অর্থঃ নিশ্চয় আল্লাহর রাসুলের মাঝে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ।

সুতরাং আপনারা কার আদর্শ গ্রহণ করেছেন: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাকি ফেরাউনের?

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, ওলামাদের নিন্দাকারী মূর্খ জাহেদদের জন্য আফসোস হয়; তারা অল্পজ্ঞানে তুষ্ট থেকে নফলকে ফরয মনে করে। কেননা হাতেম নামক এ জাহেদ যে বিষয়ের নিন্দা করেছে তা শরীয়তে বৈধ। আর বৈধ জিনিস গ্রহণের অনুমতি শরীয়তে বিদ্যমান। শরীয়ত কোন বিষয়ে অনুমতি দিয়ে তার নিন্দা করে না।

হায় আফসোস; মূর্খ লোকের আচরণ কত নিকৃষ্ট। সে যদি তাদেরকে বলতো, সম্পদ ব্যবহারে আপনারা যদি মিতব্যয়ী হতেন, যেন মানুষ আপনাদের অনুসরণে ধন্য হয়, তাহলে তা কতইনা উত্তম হত।

এ ব্যক্তি যদি শুনতো যে, সাহাবী আবদুর রহমান বিন আওফ, যোবায়ের বিন আওয়াম, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) প্রমুখ সাহাবাগণ মৃত্যুর সময় কী বিপুল সম্পদ রেখে গেছেন, তাহলে সে কী বলতো বলুনতো।

সাহাবী তামিম দারী একটি চাদর এক হাজার দিরহামে ক্রয় করেছেন এবং তার উপর দাঁড়িয়ে রাতে তাহাজ্জুদ পড়তেন।

তাই জাহেদের উপর ফরজ হলো প্রথমে আলেমদের থেকে শরীয়তের বিধি-বিধান শিক্ষা করা, আর যদি শিক্ষা গ্রহণের সৌভাগ্য তার না হয়, তাহলে কর্তব্য হলো এসব বিষয়ে নিরবতা অবলম্বন করা।

মালেক বিন দীনার (রা.) বলেন, শয়তান জাহেদদের নিয়ে খেলা করে যেভাবে শিশুরা আখরোট নিয়ে খেলা করে।

পঞ্চম অধ্যায়

ক্বারীদের উপর শয়তানের ষড়যন্ত্রের বিবরণ

ক্বারী সাহেবদের কতক এমন রয়েছেন, যারা অপ্রচলিত ক্বেরাত পাঠ ও তা অর্জনের চেষ্টায় ব্যস্ত থাকেন। ফলে তা সংগ্রহ করা, সঙ্কলন করা ও তার পঠন-পাঠনে জীবনের অধিকাংশ সময় তাদের ফুরিয়ে যায়। আর এসব নিয়ে ব্যস্ত থাকার দরুন শরীয়তের ফরয-ওয়াজিবের জ্ঞানলাভ থেকে তারা বঞ্চিত হয়।

মসজিদের কতক ইমাম সাহেবকে দেখা যায় যে, তারা মানুষকে কেরাত শিক্ষাদানের উদ্যোগ নেন; অথচ নামাজ নষ্ট হওয়ার কারণসমুহ তাদের জানা নেই।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে নেতৃত্বদানের প্রবণতা তাদেরকে জ্ঞানলাভ থেকে বিরত রাখে, ফলে শরীয়তের বিধি-বিধান অজানা থাকা সত্ত্বেও আলেমদের স্বরণাপন্ন হয়ে তাদের থেকে জ্ঞানার্জনের প্রয়োজন তারা অনুভব করেন না। তারা যদি চিন্তা করতো তাহলে বুঝতো যে,

কোরআন নাযিলের উদ্দেশ্য হচ্ছে তা বিশুদ্ধ উচ্চারণে তেলাওয়াত করা, তার আয়াতসমূহ মুখস্থ করা, আয়াতের মর্ম বুঝে তদনুযায়ী আমল করা, তারপর আত্মার পরিশুদ্ধি ও চরিত্র কলুষমুক্ত করার প্রতি মনোনিবেশ করা, অতঃপর শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলির জ্ঞানার্জনে ব্যস্ত হওয়া।

মানুষ এমন কাজে সময় ব্যয় করা যা গুরুত্বপূর্ণ নয়, এটাও ক্ষতির একটি মন্দ দিক। হাসান বসরী বলেন, কোরআন নাযিল করা হয়েছে যেন তার বিধি-বিধান জেনে মানুষ আমল করে। কিন্তু মানুষ কোরআনের তেলাওয়াতকেই আমল হিসেবে গ্রহণ করেছে; অর্থাৎ তারা শুধু তেলাওয়াত নিয়েই ব্যস্ত থাকে, আমলের প্রতি মনোনিবেশ করেনা।

তাদের কতকের অবস্থা এমন, যারা মেহরাবে উপবেশন করে অপ্রচলিত কেরাত পাঠ করে, আর মুতাওয়াতির ও মাশহুর কেরাত পরিহার করে। অথচ ওলমাদের বিশুদ্ধ মতানুসারে এসব অপ্রচলিত তেলাওয়াত দ্বারা নামাজ শুদ্ধ হবেনা।

এসব অপ্রচলিত তেলাওয়াত মানুষকে শুনানোর উদ্দেশ্য হলো, মানুষের স্তুতি লাভ করা এবং মানুষকে তার প্রতি আকৃষ্ট করা। অথচ অজ্ঞতা বশতঃ সে ধারণা করে যে, আমি কোরআন তেলাওয়াতে ব্যস্ত।

তাদের কেউ এমনও আছেন, যারা বিভিন্ন কেরাতকে একত্র করে বলেন, ملك مالك ملاك এভাবে তেলাওয়াত করা জায়েজ নয়। কেননা এতে কোরআনের স্বাভাবিক বিন্যাস ভঙ্গ করা হয়।

তাদের কতক এমনও আছেন, যারা সিজদার আয়াতসমূহ, আল্লাহর একত্ববাদ ও তার বরত্ব সম্বলিত আয়াতসমূহ একত্রে তেলাওয়াত করেন, শরীয়তে যা মাকরূহ।

আবার কারো অবস্থা এমন, যারা কোরআন খতমের উদ্দেশ্যে আগুন প্রজ্জলিত করেন; ফলে মাল নষ্টকরন, অগ্নিপূজকদের সাদৃশ্যতা অবলম্বন

এবং রাতে নারী-পুরুষের একত্রে সমবেত হওয়ার গুনাহসহ তারা বিভিন্ন গুনাহের সমারেশ ঘটান। আর ইবলিস তাদেরকে ধারণা দেয় যে, এর মাধ্যমে ইসলামের মর্যাদা সমুন্নত করা হচ্ছে। যারা এসব করে তাদের জেনে রাখা উচিত যে, তারা যা করছে তা শয়তান কর্তৃক এক প্রকার নেক ধোঁকা। কেননা শরীয়তের মর্যাদা সমুন্নত হয় বৈধ পন্থা অবলম্বনে, অবৈধ পন্থায় নয়।

ক্বারীদের কতক এমনও আছেন যারা অধিক তেলাওয়াতের প্রতিযোগিতা করেন। আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেন, আমি ক্বারীদের কতক শায়খকে দেখেছি, তারা মানুষকে একত্রিত করে কোরআন খতমের জন্য এক ব্যক্তিকে দাঁড় করান, তিনি দাঁড়িয়ে দিনে তিনবার কোরআন খতম করেন। যদি দিনে তিন খতম তেলাওয়াত করতে অক্ষম হন তাহলে তাকে ভর্ৎসনা করা হয়, আর যদি তিন খতম পূর্ণ করেন তাহলে তার প্রশংসা করা হয়। এতে-সাধারণ জনগন মুগ্ধ হয়ে তার উচ্চ প্রশংসা করেন। আর ইবলিসও তাদের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল করে যে, তেলাওয়াত যত বেশি হবে সওয়াবের পরিমাণ ততই বৃদ্ধি পাবে। এসব ক্বারীদের জেনে রাখা উচিত, তারা যা করছে তা ইবলিসের নেক চক্রান্ত। কেননা কোরআন তেলাওয়াত আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যেই হওয়া উচিত, মানুষের প্রশংসা লাভের উদ্দেশ্যে নয়। এবং তেলাওয়াত ধীরস্থিরভাবে করা উচিত, কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث অর্থঃ আমি কোরআন অবতীর্ণ করেছি খন্ড খন্ডভাবে, যেন আপনি উহা মানুষের নিকট পাঠ করতে পারেন বিরতি সহকারে।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, ورتل القرآن ترتيلا, অর্থঃ হে নবী, আপনি কোরআন তেলাওয়াত করুন ধীরে ধীরে ও সুস্পষ্টভাবে।

ক্বারীদের কতক এমনও আছেন যারা গানের সুরে কোরআন তেলাওয়াত করেন। প্রথমদিকে এ রীতি স্বাভাবিক থাকা সত্ত্বেও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল তা মাকরুহ বলেছেন। সুতরাং তেলাওয়াতে গানের সাদৃশ্যতা যত বৃদ্ধি পাবে কারাহাতের পরিমাণও তত ভয়াবহ হবে। তবে কোরআন তেলাওয়াতের স্বাভাবিক রীতি কেউ যদি লঙ্ঘন করে তাহলে তা হারাম বলে গণ্য হবে।

ক্বারীদের এক জামাতের অবস্থা হলো, তারা কতক গুনাহকে সাধারণ মনে করেন। যেমনঃ- প্রতিপক্ষের গীবত করা। আবার এ চে' বড় গুনাহও তাদের দ্বারা সঙ্ঘটিত হয়। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস, কোরআন হেফজ করা তাদেরকে এসব গুনাহের আযাব থেকে রক্ষা করবে। দলীল স্বরুপঃ তারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস পেশ করেন, لو جعل القرآن في اهاب ما احترق অর্থঃ যদি কোরআনকে চামড়ায় আবদ্ধ করে আগুনে নিক্ষেপ করা হয় তবে তা দগ্ধ হবেনা। তাদের জেনে রাখা উচিত, তারা যা ধারণা করছে তা শয়তানের নেক প্ররোচনার সুফল। কেননা শরীয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে অবগত ব্যক্তির শাস্তি অনবগত ব্যক্তির শাস্তি অপেক্ষা অধিক ভয়াবহ। যেহেতু ইলমের আধিক্য দলীলকে শক্তিশালী করে। উদাহরণ স্বরুপ দু'টি আয়াত আমরা এখানে পেশ করছিঃ

১/ আল্লাহ তায়ালা বলেন, أفمن يعلم أنما أنزل اليك من ربك الحق كمن هو أعمى অর্থঃ তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা যে ব্যক্তি সত্য বলিয়া জানে আর যে ব্যক্তি সত্য বলিয়া জানেনা, তারা উভয়ে কী সমান?

২/ অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের ব্যাপারে বলেন, يا نساء النبي من يأت منكن

بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا অর্থঃ হে নবী-পত্নিগণ, যে কাজ স্পষ্টত অশ্লীল, তোমাদের মধ্যে কেহ তাহা করিলে তাহাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হইবে।

বিখ্যাত বুযুর্গ মারুফ কারখী বলেন, বকর বিন খুনাইছ বলেছেন, إن في جهنم لوادا تتعوذ جهنم من ذلك الوادي كل يوم سبع مرات وإن في الواد لجبا يتعوذ الوادي و جهنم من ذلك الجب كل يوم سبع مرات وإن في الجب لحية يتعوذ الجب و الوادي و جهنم من تلك الحية كل يوم سبع مرات تبدأ بفسقة حملة القرآن ليقولون أي رب بدئ بنا قبل عبدة الأوثان قيل لهم ليس من يعلم كمن لا يعلم অর্থঃ জাহান্নামে একটি উপত্যকা রয়েছে, জাহান্নাম প্রতিদিন সে উপত্যকা থেকে সাতবার আশ্রয় চায়, আর সে উপত্যকায় একটি কূপ রয়েছে, উপত্যকা ও জাহান্নাম যে কূপ থেকে প্রতিদিন সাতবার আশ্রয় চায়, আর সে কূপে একটি সাপ রয়েছে; উপত্যকা, জাহান্নাম ও কূপ সে সাপ থেকে প্রতিদিন সাতবার আশ্রয় চায়। শাস্তিস্বরূপ যাদেরকে সে কূপে সর্বপ্রথম নিক্ষেপ করা হবে তারা হলেন পাপাচারে লিপ্ত ক্বারী সাহেব ও হাফেজ সাহেবগণ। নিক্ষিপ্ত হয়ে তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! মূর্তি পূজারীদের পূর্বে কেন আমাদেরকে নিক্ষেপ করা হলো! তাদেরকে উত্তরে বলা হবে, যে জানে আর যে জানে না, উভয়ে সমান নয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

গল্পকার ও ওয়াজকারীদেরকে শয়তানের ধোঁকাদানের বিবরণ

পূর্ব যামানায় যারা ওয়াজ করতেন তারা ছিলেন বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম ও ফক্বীহ সম্প্রদায়। ওবায়েদ বিন ওমায়েরের মজলিসে সাহাবী আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা.) উপস্থিত হতেন এবং ওমর বিন আবদুল আজীজও বিভিন্ন ওয়াজের মজলিসে উপস্থিত হয়ে ওয়াজ শ্রবণ করতেন।

মানুষের দীনী শিক্ষা, আত্মশুদ্ধি ও চারিত্রিক সংশোধন ছিলো এসব ওয়াজের মূল উদ্দেশ্য। তবে ক্রমান্বয়ে অজ্ঞ লোকেরাও ওয়াজ-নসীহতের কাজে নিজেদেরকে আত্মনিয়োগ করে এবং এ কাজকে নিজেদের পেশা হিসাবে গ্রহণ করে। ফলে এসব মজলিসে আলেম-ওলামা ও নেক লোকদের উপস্থিতি ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে সাধারণ জনগণ ও মহিলাদের উপস্থিতি বৃদ্ধি পায়। এসব বক্তারা শরীয়তের জ্ঞানার্জনে ব্যস্ত না হয়ে মূর্খ জনগণকে মুগ্ধ করার উদ্দেশ্যে গল্প বানানো ও ঘটনা বর্ণনায় নিজেদেরকে আত্মনিয়োগ করে। এসব মূর্খ বক্তাদের কিছু হালত আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

এসব বক্তাদের এক সম্প্রদায় এমন, যারা নেক কাজে উৎসাহদান ও অসৎকাজে ভীতিপ্রদর্শনে নিজেদের বানানো কথাকে হাদীস বলে প্রচার করে। আর ইবলিস তাদেরকে উৎসাহ দিয়ে বলে, তোমরা যা করছো তাতো অত্যন্ত মহৎকাজ। যেহেতু মানুষকে নেককাজে উৎসাহদান এবং অসৎকাজে বাধাপ্রদান তোমাদের মূল উদ্দেশ্য। তাদের জেনে রাখা উচিত যে, তারা যা করছে তা শরীয়তের প্রতি অন্যায় আচরণ। কেননা এ কাজের পরিণাম ফলতো এটাই, তারা মনে করছে যে শরীয়ত অপূর্ণ, তা পূর্ণ করা প্রয়োজন। অনন্তর তারা বিস্মৃত হয় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা, من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار অর্থঃ যে ব্যক্তি স্ব-জ্ঞানে কোন কথাকে হাদীস বলে প্রচার করবে, সে যেন জাহান্নামকে নিজের আবাসস্থল বানায়।

বক্তাদের কতক এমনও আছেন, যারা ওয়াজে সুর সংযোজন করেন, যা মানুষের মন মুগ্ধ করে, হৃদয় আন্দোলিত করে।

তারা বিভিন্ন ভঙ্গিমায় ওয়াজ করেন। আপনি দেখবেন, তারা ইশক্-মুহাব্বতের এমন মনমুগ্ধকর কবিতা পাঠ করেন মানুষের হৃদয়-মন যা দ্বারা আন্দোলিত হয়। তারা ইবলিসের ধোঁকায় প্রলুব্ধ হয়ে বলেন, আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য, আল্লাহর ইশ্ক ও মুহাব্বতের জোয়ার মানুষের হৃদয়রাজ্যে প্রবাহিত করা। অথচ এ বিষয়টি দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, তাদের মজলিসে ঐ সকল মূর্খ জনগণই উপস্থিত হয়, প্রবৃত্তির ভালোবাসা যাদের মনে ভরপুর। ফলে বক্তা নিজেও গোমরাহ হয় এবং তাদের মজলিসে যারা আসে গোমরাহিতে তাদের অগ্রগতি আরো বৃদ্ধি পায়।

বক্তাদের কতক এমনও আছেন, যারা ওয়াজ-নসীহতের সময় আবেগ ও বিনয়ের এমন ভাব প্রকাশ করেন যা তাদের অন্তরে

নেই। ফলে বিনয়ভাব ও চোখের অশ্রু বর্ষণে মানুষ তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

সুতরাং যার আবেগ ও ক্রন্দন আল্লাহর জন্য নয় সেতো আখেরাত বরবাদ করলো, আর যে এ বিষয়ে সত্যবাদী তার সত্যবাদিতাও রিয়ার বেড়াজালে আটকে গেলো।

বক্তাদের কতক এমনও আছেন, যারা আল্লাহর ভালোবাসা ও দুনিয়া বিমুখতার নিগূঢ় তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেন, আর ইবলিসও তাদেরকে প্ররোচনা দিয়ে বলে, তুমিতো এসব গুণে গুণান্বিত। কেননা এসব বিষয়ের জ্ঞানলাভের পর তদনুযায়ী আমল যদি না করতে তাহলে জানা সত্ত্বেও তুমি তার নিগূঢ় তত্ত্ব বর্ণনা করতে সক্ষম হতেনা।

শয়তানের এহেন প্ররোচনার শিকার যদি কেউ হয় তাহলে মনকে এ বলে সতর্ক করবে যে, জানা বিষয় বর্ণনা করতে পারা এবং তা আমলে বাস্তবায়ন করা এক জিনিস নয়। তদুপরি একটি অর্জিত হলে যে অন্যটি হাসিল হবে তা আবশ্যকও নয়।

বক্তাদের কতক এমনও আছেন, যারা কেয়ামত দিবসের এমনসব আলোচনা করেন শরীয়তে যার বর্ণনা অবিদ্যমান। এসব আলোচনার প্রমাণ স্বরুপ তারা বিভিন্ন প্রেমকাব্য আবৃত্তি করেন, মূর্খ লোকেরা যা দলীল বলে বিশ্বাস করে। এসব আলোচনার উদ্দেশ্য হলো, সাধারণ জনগণ যেন তা শ্রবণে ভীত-বিহ্বল হয় এবং চিৎকার ক্রন্দনে তার মজমা জমজমাট হয়।

আবার কেউকেউ ছন্দ আকারে এমনসব বাক্য বলেন, যা সম্পূর্ণ অর্থহীন। তাদের আলোচনার অধিকাংশ বিষয়বস্তু হলো, নবী মূসা, ইউসুফ ও জোলায়খার ঘটনা বর্ণনা করা। অথচ তারা শরীয়তের

অতি গুরুত্বপূর্ণ ফরয-ওয়াজিবের আলোচনা করেন না এবং মিথ্যা-পাপাচারের ভয়াবহতা বর্ণনা করে তা থেকে মানুষকে সতর্ক করেন না।

যদি গল্প-ঘটনাই ওয়াজের আলোচ্য বিষয় হয় তাহলে কখন যেনাকারী ব্যাভিচার থেকে ফিরে আসবে, সুদখোর সুদগ্রহণ পরিহার করবে এবং স্ত্রী জানতে পারবে তার প্রতি রয়েছে স্বামীর কী কী অধিকার!

হায় আফসোস! এরা শরীয়তকে অগ্রাহ্য করেছে, ফলে নফসের তাবেদার মূর্খসমাজে তাদের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। কেননা হক্ব ভারী আর বাতিল হাল্কা; অর্থাৎ শরীয়তের আলোচনা বিস্বাদ লাগে, আর গল্প-ঘটনায় মন প্রফুল্ল হয়।

বক্তাদের কতক এমনও আছেন, যারা মানুষকে দুনিয়া বিমুখতা ও রাত্রি জাগরণে উদ্বুদ্ধ করেন, কিন্তু জনসাধারণের জন্য এসবের উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন না। ফলে তাদের কেউ তওবা করে ঘরের কোনে এবাদতে নিমগ্ন হন অথবা নির্জন পাহাড়ে গিয়ে পরকাল সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন; ফলে তাদের পরিবার হয় অভিভাবকশূন্য, তারা না পায় ক্ষুধা নিবারণের অন্ন না পায় দেহ ঢাকার মতো প্রয়োজনীয় বস্ত্র।

তাদের কতক এমনও আছেন, যারা আশা-প্রত্যাশার বয়ান করে মানুষকে বলেন, আপনারা আল্লাহর রহমতের আশা বেশি পরিমাণে করুন; কিন্তু এমন বিষয়ের আলোচনা করেন না, যা মানুষের দিলে আল্লাহর ভয় জাগ্রত করবে এবং গুনাহ থেকে বিরত রাখবে। ফলে দুনিয়ার প্রতি মানুষের ঝোঁক বেড়ে যায় এবং দ্রুতগামী যানবাহন,

উন্নতমানের পোষাক ও রঙ বেরঙের সুস্বাদু খাবার তাদেরকে মুগ্ধ করে, তাই এসব লাভের চেষ্টায় তাদের পরকাল বরবাদ হয়। তাই এসব বক্তাদের কথা-কাজ মানুষের অন্তরকে বিনষ্ট করে।

◇গল্পকার বক্তাদের কতক এমনও আছেন, যারা মজলিসে নারী-পুরুষের সংমিশ্রণ ঘটান। আপনি মহিলাদেরকে দেখবেন, যদি বক্তব্যের মাঝে দুঃখজনক কোন ঘটনার বর্ণনা এসে যায় তাহলে মনের আবেগ প্রকাশার্থে তারা সজোরে চিৎকার দেন। অথচ গল্পকার এ বক্তা চিৎকার থেকে তাদেরকে বারণ করেন না, যেন নারী-পুরুষ সকলেই তার ভক্ত হয়।

অবশ্য এ যামানায় এমন একদল গল্পকার বক্তার আবির্ভাব ঘটেছে যাদের বিষয়টি শয়তানের নেক সুরতে ধোঁকার অন্তর্গত নয়, যেহেতু তাদের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট – তারা ওয়াজ-মাহফিলে ঘটনা বর্ণনাকে নিজেদের জীবিকা নির্বাহের উপায় হিসাবে গ্রহণ করার কারণে।

অনেক মুহাক্কিক আলেমের উপরেও শয়তানের নেক চক্রান্তের মিশন সফলতা লাভ করে। সে মুহাক্কিক আলেমকে ধোঁকাদিতে এমন সূক্ষ্ম কৌশল অবলম্বন করে, আলেম ভাবতেও পারেনা যে শয়তানের চক্রান্ত এমন হতে পারে। সে আলেমকে বলে, তোমার মতো অধম অন্যাকে নসীহতের কী যোগ্যতা রাখে! নসীহততো ঐ ব্যক্তি করবে, যে মন্দকাজ থেকে পূর্ণ সতর্ক এবং সৎকাজের ব্যাপারে পূর্ণ সচেতন। শয়তানের এহেন চক্রান্তে আলেমের বাকরুদ্ধ হয়, ফলে ওয়াজ-নসীহত থেকে সে নিবৃত্ত হয়।

নিজেকে অধম মনে করে ওয়াজ-নসীহত থেকে বিরত থাকা শয়তানের একপ্রকার চক্রান্ত, কেননা ওয়াজ-নসীহতের উদ্দেশ্য

হচ্ছে মানুষকে সৎকাজের আদেশ ও মন্দকাজ থেকে বারণ করা, শরীয়তে যা ওয়াজিব; যদিও মন্দকাজের এ প্রবণতা আদেশকারীর মাঝে থাকুক। তবে মন্দকাজে বাঁধাদানকারী ব্যক্তি যদি মন্দকাজ হতে বিরত সৎকর্মপরায়ণ হয় তাহলে মন্দকাজে তার বাঁধাদান মানুষকে প্রভাবিত করবে, আর সে যদি মন্দকাজ হতে বিরত সৎকর্মপরায়ণ না হয় তাহলে মন্দকাজে তার বাঁধাদান মানুষকে না প্রভাবিত করার উপক্রম হবে। তাই মন্দকাজে বাঁধাদানকারীর উচিত নিজেকে পরিশুদ্ধ করা, যেন তার বাঁধাদান মানুষকে প্রভাবিত করে।

সপ্তম অধ্যায়

আরবী ভাষাবিদ ও সাহিত্যিকদের উপর শয়তানের নেকচক্রান্তের বিবরণ

অধিকাংশ আরবী সাহিত্যিকের অবস্থা হলো, তারা নাহু-সরফ ও ভাষাসাহিত্য নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু শরীয়ত মোতাবেক জীবন পরিচালনা করতে যে জ্ঞানের প্রয়োজন, যা শিক্ষাকরা প্রত্যেকের উপর ফরযে আইন, তা শিখার প্রতি এবং শিষ্টাচার ও আত্মার পরিশুদ্ধির জন্য যা শিক্ষাকরা তাদের জন্য উত্তম তারা তা শিখার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন না। তদুপরি তারা বিমুখ হন কোরআন হাদীসের ব্যাখ্যা ও ইসলামী আঈনশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন থেকে, অথচ এসব বিষয়ে পাণ্ডিত্যঅর্জন তাদের জন্য সর্বোত্তম।

অথচ যা শিক্ষাকরা ফরয কিংবা যা শিক্ষাকরা সর্বোত্তম তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে তারা জীবনের গোটা সময় এমন বিষয়ের জ্ঞানার্জনে ব্যয় করেন যা শিক্ষাকরা মুখ্যউদ্দেশ্য নয়, বরং তা শিক্ষা এ জন্যই করা হয় যেন তার মাধ্যমে জানা আবশ্যক বিষয়ের জ্ঞানার্জন সম্ভব হয়।

সুতরাং কোরআন হাদীসের কোন বিষয়ের অর্থ বুঝার সক্ষমতা যদি কেউ লাভ করে তাহলে তার কর্তব্য হলো তার উপর আমল করে পরকালের উন্নতি সাধন করা। যেহেতু ভাষার জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যই হলো কোরআন হাদীস থেকে শরীয়তের বিধি-বিধান আহরণ করে তদনুযায়ী আমল করা।

অথচ এসব আরবী সাহিত্যিকদের অনেকেই এমন আছেন, শরীয়তের বিধি-বিধান ও শিষ্টাচার যাদের তেমন জানা নেই এবং আত্মার পরিশুদ্ধি ও চরিত্র সংশোধনের প্রতি যাদের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই, এতদসত্ত্বেও তারা দম্ভ-অহঙ্কারে লিপ্ত।

ইবলিস তাদের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল করে যে, তোমরাতো ইসলামের আলেম সমাজ, কেননা নাহু-সরফ ও ভাষাসাহিত্য হচ্ছে ইসলামেরই জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং তার মাধ্যমেই জানা যায় কোরআন হাদীসের অর্থ ও মর্ম।

আমার জীবনের শপথ করে বলছি, কোরআন হাদীসের অর্থ ও মর্মোদ্ধারে ভাষাজ্ঞানের প্রয়োজনিয়তা অনস্বীকার্য; কিন্তু আরবী ভাষায় কথা বলার যোগ্যতা অর্জন এবং কোরআন হাদীসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও অর্থ বোঝার জন্যতো জীবনব্যাপী সাধনার কোন প্রয়োজন নেই, বরং সেজন্য অল্প সময় ব্যয় করাই যথেষ্ট।

যে পরিমাণ ভাষাজ্ঞান না হলে কোরআন হাদীসের মর্মোদ্ধার অসম্ভব সে পরিমাণ ভাষাজ্ঞান এবং সে জন্য প্রয়োজন মাফিক সময় ব্যয় অত্যন্ত জরুরী, আর যে ভাষাজ্ঞান প্রয়োজনের আওতামুক্ত তা অর্জনে জীবনের মূল্যবান সময় ব্যয় অনর্থক ও নিষ্প্রয়োজন।

সুতরাং যে বিষয়ের জ্ঞানলাভ অত্যাবশ্যক সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে যা অর্জন অনাবশ্যক তার অন্বেষণে জীবনের মূল্যবান সময়

ব্যয়করা এমন চরম ভুল যার কোন ক্ষতিপূরণ নেই, আর কোরআন হাদীসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও ইসলামী আঈনশাস্ত্র অধ্যয়নের উপর আরবী ভাষাজ্ঞানকে প্রাধান্যদেয়া এমন লোকসান যার উপর পরিতাপের কোন সীমা নেই।

যদি সকল বিষয়ে জ্ঞানার্জনের জন্য জীবন সংকুলান হতো তাহলে বড়ই উত্তম হতো। কিন্তু জীবন বড় সংক্ষিপ্ত, তাই গুরুত্বপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ বিষয়কে প্রাধান্য দেয়াই বুদ্ধিমানের কর্তব্য।

এসব ভাষাবিদরা কোরআন হাদীসের জ্ঞানার্জন থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখার দরুন শব্দজ্ঞানের পুঁজি নিয়ে শরীয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে এমন ফতোয়া দেন যা নিতান্ত ভুল।

আবুল হাসান বিন ফারেছ বলেন, আরবের জনৈক ভাষাপণ্ডিতকে জিজ্ঞেস করা হলো, যদি কেউ 'ইশহাদ' করে তাহলে কী তার উপর ওজু ওয়াজিব হবে? সে উত্তরে বললো, হাঁ। আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেন, এ জাতীয় বহু মনগড়া ফতোয়া এই ভাষাসাহিত্যিক থেকে প্রকাশ পেয়েছে; তবে এ ভুলটি অতিশয় মারাত্মক।

তার ফতোয়ার অশুদ্ধতা যাচাইয়ের পূর্বে আমাদের জেনে নেয়া উচিত যে, 'ইশহাদ' এ আরবী শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। তার একটি অর্থঃ স্বাক্ষ দেয়া, আরেকটি অর্থঃ মযী নির্গত হওয়া। সুতরাং কোন শব্দ যদি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয় তাহলে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পূর্বেই তার একটি অর্থ গ্রহণ করে তদনুযায়ী ফতোয়া দেয়া চরম অন্যায়।

উদাহরণ স্বরুপঃ- ফতোয়া তলবকারী ব্যক্তি যদি বলে, কোন মহিলার 'কুরু' চলাকালীন সময়ে তার সাথে সঙ্গমকরার কি বিধান? "ভাষাবিদদের নিকট 'কুরু' শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়; এক অর্থ

অনুযায়ী তা হায়েজ, অন্য অর্থ অনুযায়ী তুহুর" সুতরাং কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়াই মুফতি সাহেব যদি 'কুরু' কে তুহুর অর্থে গ্রহণ করে বলেন, 'কুরু' চলাকালীন সময়ে স্ত্রীর সাথে সঙ্গমকরা জায়েজ, অথবা 'কুরু' কে হায়েজ অর্থে গ্রহণ করে বলেন, 'কুরু' চলাকালীন সময়ে স্ত্রীর সাথে সঙ্গমকরা জায়েজ নয় তাহলে তা মারাত্মক ভুল হবে।

সুতরাং আরবের ভাষাসাহিত্যিক যে ফতোয়া দিয়েছেন তা দুই কারণে ভুল: প্রথমতঃ সে 'ইশহাদ' শব্দটির অর্থসমূহ ব্যাখ্যা করেনি, দ্বিতীয়তঃ সে ফতোয়াদানের ক্ষেত্রে শব্দটির দূরবর্তী অর্থ গ্রহণ করেছে এবং প্রচলিত অর্থ পরিহার করেছে।

তদুপরি ভাষাজ্ঞানের পুঁজি নিয়েই এসব ভাষাবিদরা নিজেদেরকে ফতোয়াদানে যোগ্য মনে করে। এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, শরীয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞানস্বল্পতাই তাদেরকে এরূপ পদস্খলনে উদ্বুদ্ধ করে।

যেহেতু ভাষাসাহিত্যিকদের মূল ব্যস্ততা জাহেলী যুগের কবিতা নিয়ে, হাদীস অধ্যয়ন ও পূর্বসূরি নেককারদের জীবনেতিহাস জানা তাদের নিকট নিষ্প্রয়োজন, তাই শয়তানের প্ররোচনা ও নফসের অনুসরণ তাদেরকে ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত করে। আপনি তাদের কম লোককেই দেখবেন যারা তাক্বওয়ার উপর চলেন এবং খাবারের হালাল-হারামের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখেন। কেননা ভাষাসাহিত্য এমন একটি বিদ্যা যা তার অন্বেষণকারীদেরকে রাজা-বাদশাহদের দ্বারস্থ হতে উদ্বুদ্ধ করে; ফলে তারা বাধ্য হন তাদের হারাম মাল ভক্ষণ করতে। যেমনঃ- ভাষাসাহিত্যিক আবু আলী ফারেসী দ্বারস্থ হয়েছেন বাদশাহ আদুদ দাওলার এবং লালিতপালিত হয়েছেন তার তত্ত্বাবধানে।

শরীয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে তাদের জ্ঞানস্বল্পতার দরুন তারা কোন বিষয়কে জায়েজ মনে করেন, অথচ শরীয়তে তা নাজায়েজ। যেমন বিখ্যাত নাহুবিদ যুজাজ আবু ইসহাক্ব ইবরাহিম বিন সারী বলেন, আমি ক্বাসেম বিন আবদুল্লাহকে সাহিত্য শিখাতাম। একদিন আমি তাকে বললাম, আপনি যদি আপনার বাবার স্থলাভিষিক্ত হয়ে মন্ত্রিত্ব লাভ করেন তাহলে উপহার স্বরুপ আমাকে কী দিবেন? তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কী পসন্দ করেন? আমি বললাম, আমি পসন্দ করি যে আপনি আমাকে বিশহাজার দীনার দিবেন। তিনিও আমাকে তা দেয়ার ব্যাপারে ওয়াদাবদ্ধ হলেন এবং এটাই ছিলো আমার চূড়ান্ত আশা। কয়েক বছর অতিবাহিত না হতেই ক্বাসেম মন্ত্রিত্ব লাভ করে এবং আমিও তার সাথে সার্বক্ষণিক সম্পর্ক বজায় রাখি; ফলে একপর্যায়ে আমি হই তার অন্তরঙ্গ বন্ধু। মন্ত্রিত্বলাভের পর তাকে আমার সাথে কৃত ওয়াদার বিষয়টি স্বরণ করাতে মনস্থ হই। কিন্তু মন্ত্রিত্বলাভের তৃতীয়দিন তিনি আমাকে বললেন, হে আবু ইসহাক্ব! আমি দেখছি যে, আপনিতো ওয়াদার বিষয়টি আমাকে স্বরণ করাচ্ছেন না! আমি বললাম, আমিতো মন্ত্রীমহোদয়ের পৃষ্ঠপোষকতার উপর আস্থাশীল। আল্লাহ মন্ত্রীমহোদয়কে শক্তিশালী করুন, খাদেমের প্রতিশ্রুতির বিষয়ে তাকে স্বরণ করানোর মুখাপেক্ষী তিনি নন; যেহেতু এটা তার নৈতিক দায়িত্ব। ক্বাসেম বললেন, আপনি অবশ্যই সাহায্যপ্রাপ্ত। অতঃপর বললেন, আপনাকে এ বিশহাজার দীনার একসাথে দেয়া আমার জন্য বড় বিষয় নয়, কিন্তু আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, এভাবে অর্থ প্রদান করলে মানুষ আমার সমালোচনা করবে। তবে তা পর্যায়ক্রমে গ্রহণের একটি উপায় আমি আপনাকে বলছি, আপনি তা অবলম্বন করুন। আমি বললাম, আপনি যা ভালো মনে করেন।

তিনি বললেন, আপনি মানুষের সামনে বসে তাদের বড় ধরনের সমস্যাগুলো চিরকুটের মাধ্যমে আমার নিকট পেশ করুন এবং তাদের সমস্যা সমাধানের বিষয়ে আমার সাথে আপনার আলোচনার জন্য তাদের থেকে বিনিময় গ্রহণ করুন। আপনার সাথে আমার ওয়াদাকৃত সম্পদ যতদিন আপনার অর্জিত না হবে ততদিন এ পদ্ধতি অব্যাহত রাখুন।

তার কথা মতো আমি কাজ শুরু করলাম। প্রয়োজনগ্রস্ত লোকদের একটি করে চিরকুট আমি প্রতিদিন মন্ত্রির সামনে পেশ করতাম, আর তিনি তাতে সই করতেন; বিনিময়ে আমি গ্রহণ করতাম মোটা অঙ্কের অর্থ। মাঝে মাঝে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করতেন, আমার থেকে সই নেয়ার বিনিময়ে তারা আপনাকে কত দিবে? আমি একটি পরিমাণ উল্লেখ করলে তিনি বলতেন, এতো খুবই কম; এর বিনিময়তো আরো অনেক বেশি। সুতরাং আপনি আরো বেশি দাবি করুন। আমি লোকদের নিকট গিয়ে আরো বেশি অর্থের দাবি করলে তারা আমাকে বাড়িয়ে দিতো।

তিনি বলেন, একদিন বড় ধরনের একটি কাজ উদ্ধারের জন্য আমি মন্ত্রীর স্বাক্ষর নেই, বিনিময় স্বরুপ তাদের থেকে যে অর্থ আমি লাভ করি তা দ্বারা আমার বিশহাজার দীনার পূর্ণ হয়। এভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হলে আমার আয় বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।

কয়েকমাস পর ক্বাসেম আমাকে বললেন, হে আবু ইসহাক্ব! আপনার সাথে ওয়াদাকৃত বিশহাজার দীনার কি আপনার অর্জিত হয়েছে? আমি উত্তরে নেতিবাচক জবাব দিলে তিনি চুপ রইলেন, ফলে আমার স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী স্বাক্ষর করানোর বিনিময়ে মানুষ থেকে অর্থ উপার্জনের ধারা অব্যাহত রইলো।

প্রতিমাসেই মন্ত্রীমহোদয় আমাকে জিজ্ঞেস করতেন, ওয়াদাকৃত বিশহাজার দীনার কি অর্জিত হয়েছে? আমি উত্তরে বলতাম, না; যেন মাল উপার্জনের এ ধারা বন্ধ না হয়।

এক পর্যায়ে সম্পদের পাহাড় আমার হস্তগত হলে ক্বাসেম আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ওয়াদাকৃত বিশহাজার দীনার কি অর্জিত হয়েছে? আমি এবার মিথ্যা বলতে লজ্জাবোধ করে বললাম, মন্ত্রীমহোদয়ের অনুগ্রহে আমার তা অর্জিত হয়েছে। তিনি তখন বললেন, আল্লাহর কসম; আপনি আমার থেকে বিপদ দূর করেছেন। আপনার জন্য তা অর্জিত হওয়ার ব্যাপারে মনোগতভাবে আমি অস্থির ছিলাম।

অতঃপর তিনি দোয়াত-কলম হাতে নিয়ে আমার জন্য তিনহাজার দীনারের চেক লিখে তার কোষাধ্যক্ষের নিকট পাঠালে আমি তার থেকে দীনারগুলো গ্রহণ করি।

পরদিন সকালে আমার স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী তার সামনে উপবেশন করলে তিনি ইশারায় বললেন, চিরকুট নিয়ে আসুন, আমি তাতে সই করে দেই। আমি বললাম, আমি আজ কারো থেকে চিরকুট গ্রহণ করি নাই। কেননা আপনার সাথে আমার যে ওয়াদা ছিলো তাতো পূর্ণ হয়েছে; তাই আমার জানা নেই যে, কিসের ভিত্তিতে আমি মন্ত্রী মহোদয় থেকে সই নিব। তিনি বললেন, হায় সুবহানাল্লাহ; আপনি কী মনে করেন যে, আমি আপনার থেকে এ দায়িত্ব ছিনিয়ে নিবো! অথচ তা আপনার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে এবং তার মাধ্যমে আপনার অবস্থান মানুষের মাঝে সুউচ্চ হয়েছে, আর ছড়িয়ে পড়েছে আপনার খ্যাতি-সুখ্যাতি দেশের চতুর্দিকে, তদুপরি সকাল-সন্ধা মানুষ দ্বারস্থ হয় আপনার দুয়ারে!

আরেকটি বিষয় হচ্ছে, আপনার থেকে এ দায়িত্ব রহিত হওয়ার কারণতো মানুষের জানা নেই, ফলে মানুষ ধারণা করবে যে, আমার নিকট আপনার খ্যাতি হ্রাস পাওয়া এবং আপনার মর্যাদা ক্ষুণ্ন হওয়ার কারণেই আপনার থেকে এ দায়িত্ব রহিত করা হয়েছে। সুতরাং আপনার পূর্ব রীতির উপর আপনি বহাল থাকুন এবং মানুষ থেকে চিরকুট গ্রহণ করে বেহিসাব অর্থ উপার্জন করুন।

তখন আমি তার হাত চুম্বন করে পরদিন সকালে মানুষের চিরকুট গ্রহণ করে মন্ত্রীমহোদয় থেকে স্বাক্ষর নিয়ে অর্থ উপার্জনের পথে দিনদিন অগ্রসর হই। ক্বাসেমের মৃত্যু পর্যন্ত আমি প্রতিদিন মানুষের প্রয়োজন সম্বলিত চিরকুট তার থেকে স্বাক্ষর করাই, বিনিময়ে অর্জন করি তাদের থেকে বিপুল সম্পদ এবং গড়ে তুলি সম্পদের বিশাল পাহাড়।

আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেন, ভেবে দেখুন: শরীয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞানস্বল্পতা মানুষের সাথে কিরূপ আচরণ করে। কেননা এ বিখ্যাত নাহুবিদ ও ভাষাসাহিত্যিক যদি জানতো যে, অর্থ উপার্জনের যে পন্থা সে অবলম্বন করেছে তা শরীয়তে বৈধ নয়, তাহলে সে গর্বকরে তা বর্ণনা করতো না। কেননা জুলুমকারীর জুলুমের বিচার এবং রাষ্ট্রের যেসব দায়িত্বে মন্ত্রীকে নিযুক্ত করা হয়েছে তা পালন করা তার উপর ওয়াজিব, তার বিনিময়ে কোনরূপ ঘুষগ্রহণ শরীয়তে বৈধ নয়। সুতরাং যে তার দায়িত্বে নিযুক্ত নয় তার জন্য ঘুষগ্রহণ কিভাবে বৈধ হবে! এর মাধ্যমেই অন্যান্য বিদ্যার উপর ইসলামী আইন শাস্ত্রের মর্তবা স্পষ্টরূপে বুঝে আসে।

অষ্টম অধ্যায়

খাঁটি আলেমদের উপর শয়তানের নেকচক্রান্তের বিবরণ

আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেন, এক সম্প্রদায়ের অবস্থাতো এমন যারা উচ্চ মনোবলের কারণে কোরআন, হাদীস, ফিক্হ ও ভাষাসাহিত্যসহ শরীয়তের বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জন করে দুনিয়া-আখেরাতে নিজেদের মর্যাদা সমুন্নত করেন। তখন শয়তান তাদের নিকট এসে ধোঁকার নেক দুয়ার তাদের সামনে উন্মোচন করে। সে তাদের অর্জিত জ্ঞান ও অন্যের নিকট তা পৌঁছানোর ফযীলত তাদের সামনে তুলে ধরে নিজেদেরকে নিজেদের নিকট বড় করে তোলে।

সুতরাং তাদের কাউকে সে প্ররোচিত করে ইল্ম অন্বেষণে দীর্ঘ শ্রম ব্যয় করার কারণে, তখন সে তার সামনে আরাম-আয়েশের বিষয়টি উত্তম করে তোলে। সে তাকে বলে, আর কতকাল এভাবে পরিশ্রম করবে? এখন সময় এসেছে, কষ্টভোগ থেকে নিজেকে একটু বিশ্রাম দাও, মন যা চায় তা ভোগকরার জন্য নিজেকে একটু অবকাশ দাও। যদি কখনো তোমার স্খলন ঘটে যায় তাহলে শাস্তি হতে ইলম

তোমাকে রক্ষা করবে। অনন্তর সে তুলে ধরে তার সামনে আলেমদের শ্রেষ্ঠত্ব ও ফযীলত।

সুতরাং এ বান্দা যদি শয়তানের চক্রান্ত হতে রক্ষা পেতে ব্যর্থ হয় এবং শয়তানের উন্মোচিত নেক দুয়ারে প্রবেশ করে তাহলে সে ধ্বংস হবে। আর যদি সে আল্লাহর তাওফীকে চক্রান্ত হতে রেহাই পায় তাহলে তার কর্তব্য হলো শয়তানকে এ কথা বলা, তোমার বক্তব্যের তিনপ্রকার ব্যাখ্যা আমার নিকট রয়েছে।

প্রথমতঃ আলেমের ফযীলত তো আমলের ভিত্তিতেই নির্ণীত হয়েছে। সুতরাং যদি ইলম অনুযায়ী আমল না থাকে তাহলে সে ইলম অর্থহীন। আমি যদি ইলম অনুযায়ী আমল না করি তাহলেতো আমি ঐ ব্যক্তির মতো হয়ে যাবো যে ইলমের উদ্দেশ্য বুঝতে সক্ষম নয়। তদুপরি আমার দৃষ্টান্ত হবে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে খাবার জমা করে ক্ষুধার্তদেরকে খাইয়েছে কিন্তু নিজে তা থেকে ভক্ষণ করে নি, ফলে সে খাবার ক্ষুধা নিবারণে তার কোন উপকারে আসেনি।

দ্বিতীয়তঃ বেআমল আলেমের নিন্দা প্রকাশার্থে যেসব হাদীস ও আছার বর্ণিত হয়েছে তা স্বরণ করে শয়তানের বিরোধিতা করা। উদাহরণ স্বরুপ কয়েকটি বর্ণনা আমরা এখানে পেশ করছিঃ-

১/ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه অর্থঃ কেয়ামতের দিন সর্বাধিক কঠিন শাস্তি ঐ আলেমের হবে, যে তার ইলম দ্বারা উপকৃত হয়নি।

২/ অন্য রেওয়ায়েতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, يجاء بالرجل يوم القيامة فيلق

في النار فتندلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي فلان ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه অর্থঃ কেয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হলে তার নারীভূড়ি বের হয়ে জাহান্নামে পড়ে যাবে; তখন সে তার চতুর্পাশে এমনভাবে ঘুরবে যেভাবে গাধা জাঁতাকলের চতুর্পাশে ঘুরে। তখন জাহান্নামবাসী তার নিকট সমবেত হয়ে বলবে, হে অমুক! তোমার এ অবস্থা কেন? তুমি না আমাদেরকে সৎকাজের আদেশ করতে এবং অসৎকাজ থেকে বারণ করতে? সে তখন বলবে, আমি তোমাদেরকে সৎকাজের আদেশ করতাম কিন্তু নিজে তা করতাম না, আর তোমাদেরকে অসৎকাজ থেকে বারণ করতাম কিন্তু নিজেই তাতে লিপ্ত হতাম।

৩/ বিখ্যাত সাহাবী আবু দারদা (রা.) বলেন, ويل لمن يعلم مرة وويل لمن علم ولم يعمل سبع مرات অর্থঃ যে জানে তার ধ্বংস একবার, আর যে জানে কিন্তু আমল করেনা তার ধ্বংস সাতবার।

তৃতীয়তঃ এলেম থাকা সত্ত্বেও আমল না করার কারণে যেসব আলেমরা ধ্বংস হয়েছে তাদের শাস্তির কথা স্বরণ করা, যেমনঃ- ইবলিস, বালআম ও অন্যান্যরা।

অবশ্য বেআমল আলেমের নিন্দা প্রকাশের জন্য আল্লাহ তায়ালার একটি উদাহরণই যথেষ্ট। আল্লাহ তায়ালা বলেন, مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا অর্থঃ যারা তাওরাত

প্রাপ্ত হয়েছে কিন্তু তাওরাতে বর্ণিত বিধানাবলির উপর আমল করেনি তাদের দৃষ্টান্ত ঐ গাধার ন্যায় যে পুস্তক বহন করে।

অর্থাৎ গাধা যেভাবে মূল্যবান বই-পুস্তক বহন করা সত্ত্বেও সে কি বহন করছে সে ব্যাপারে এবং তাতে কী মূল্যবান বিদ্যা রয়েছে তা সম্বন্ধে বেখবর, তদ্রুপ বেআমল আলেমও ইলম অনুযায়ী আমল না করার কারণে লব্ধজ্ঞান ও জ্ঞানের দাবি সম্পর্কে মূর্খ প্রমাণিত হলো।

পরিপূর্ণ ইলম ও আমলের অধিকারী এক শ্রেণীর আলেমকে নেকসুরতে ধোঁকা দেয়ার জন্য শয়তান আরেক পদ্ধতি অবলম্বন করে। তা হচ্ছে, সে তাদের মনে ইলমের কারণে বড়ত্বভাব, সমকক্ষদের প্রতি বিদ্বেষভাব এবং নেতৃত্বলাভের জন্য আত্মপ্রদর্শনের উদ্রেক করে।

কখনো সে তাদেরকে প্ররোচনা দিয়ে বলে, এটাতো তোমাদের প্রাপ্য অধিকার; আবার কখনো তা অর্জনের ভালোবাসা তাদের দীলে মজবুতভাবে গেঁথে দেয়। ফলে তা ভুল হওয়া সত্ত্বেও তা অর্জনের চেষ্টায় তারা আত্মনিয়োগ করে।

শয়তান কর্তৃক এসব প্ররোচনার শিকার যদি কেউ হয় তাহলে মুক্তি লাভের উপায় হলো, অহঙ্কার, বিদ্বেষ ও আত্মপ্রদর্শনের পরিণামফল গভীরভাবে চিন্তা করা এবং নিজেকে এ বিষয় স্বরণ করানো যে, এসব গুনাহের শাস্তি প্রতিহত করার শক্তি ইলমের নেই, বরং এলেমতো শাস্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করবে – ইলমের ভিত্তিতে দলীল-প্রমাণ মজবুত হওয়ার কারণে।

আমাদের পূর্বসূরি আমলদার ওলামায়ে কেরামের জীবনাদর্শ যে গভীরভাবে চিন্তা করবে তার অন্তর অবশ্যই শান্ত হবে এবং অহঙ্কার প্রদর্শন সে কিছুতেই করবেনা। আর আল্লাহর মা'রেফত যে হাসিল করবে সে অবশ্যই আত্মপ্রদর্শনের নিন্দা করবে। আর যে এ বিষয়টি

লক্ষ রাখে যে, মানুষের ভাগ্যের চাকা আল্লাহর ইচ্ছা অনুপাতে ঘুরে, সে কিছুতেই হিংসা করবেনা।

এই শ্রেণীর আলেমদেরকে ধোকা দেয়ার জন্য শয়তান ভিন্ন কৌশলও অবলম্বন করে, যা অতি সূক্ষ্ম। সে তাদেরকে বলে, উচ্চ মর্যাদালাভের চেষ্টা তোমাদের জন্য অহঙ্কার নয়; কেননা তোমরা হলে শরীয়তের প্রতিনিধি, ফলে তোমাদের মর্যাদা উঁচু হলে শরীয়তের মর্যাদাও বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং উচ্চ মর্যাদালাভের জন্য তোমাদের চেষ্টা – এটাতো দীনেরই স্বার্থে; যা দ্বারা দীন শক্তিশালী হবে এবং বিদআত ধ্বংস হবে।

আর ইসলাম বিদ্বেষীর প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে তার সমালোচনায় নিজ জবান ব্যবহার করার ক্ষোভতো নিজের স্বার্থে নয় বরং তা শরীয়তের স্বার্থে, আর শরীয়ততো এমন হিংসুকেরই নিন্দা করে যার হিংসা হয় নিজ স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে।

আর তোমরা যে বিষয়টিকে রিয়া মনে করছো তা মূলতঃ রিয়া নয়, কেননা তোমরা যদি বিনয় ও ক্রন্দনের ভান করো তাহলে মানুষ তোমাদের অনুসরণ করবে, যেভাবে ডাক্তারের অনুসরণ করে। অর্থাৎ ডাক্তার যদি স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বস্তু পরিহারের পরামর্শ দেন তাহলে মানুষ তার কথার অনুসরণ যতটুকু করবে, তার চে' বেশি অনুসরণ করবে যদি ডাক্তার নিজে তা পরিহার করেন।

উল্লিখিত বিষয়গুলো শয়তানের ধোকা হওয়ার দলীল হলো, কোন অহঙ্কারী যদি অন্য আলেমের সাথে অহঙ্কার সুলভ আচরণ করে এবং মজলিসে তার চে' উঁচু আসনে বসে অথবা কোন হিংসুক যদি তার মানহানি করে, তাহলে সে ঐ পরিমাণ ক্ষুব্ধ হবেনা যে পরিমাণ ক্ষুব্ধ হবে এসব আচরণ তার সাথে করা হলে। সুতরাং আলোচিত এ আলেম যদি শরীয়তের সত্যিকার প্রতিনিধি হতো তাহলে সে অন্য

আলেমের মানহানিতেও ঐ পরিমাণ ক্ষুব্ধ হতো যে পরিমাণ ক্ষুব্ধ নিজের মানহানিতে হয়; কেননা আলেমের মানহানিতো ইলমেরই মানহানি।

আর রিয়াতো এমন একটি বিষয় শরীয়তে যার অবকাশ কোন মুসলমানের জন্য নেই, আর মানুষকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য রিয়ার পথ অবলম্বনও শরীয়তসম্মত নয়।

আইয়্যুব সাখতিয়ানীর অবস্থাতো এমন, তিনি কোন হাদীস বর্ণনা করলে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে চেহারা মুছতে মুছতে বলতেন, কী ভীষণ ঠান্ডা।

তদুপরি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি হাদীসই শয়তানের ধোঁকা নির্ণয়ের জন্য যথেষ্ট। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, إنما الأعمال بالنيات অর্থঃ আমলের প্রতিদান নিয়্যাতের উপর নির্ভর করে।

এই শ্রেণীর আলেমদের কতক এমনও আছেন, তাদের সামনে যখন অন্যের দোষ বর্ণনা করা হয় তারা মনে মনে আনন্দিত হন। অথচ এ কারণে সে তিন প্রকার গুনাহের সম্মুখীন হয়ঃ- ১/ গীবতকারী থেকে নাফরমানি প্রকাশ পাওয়া সত্ত্বেও আনন্দিত হওয়া। ২/ মুসলমানের সমালোচনায় আনন্দিত হওয়া। ৩/ তার উপস্থিতিতে নাফরমানি হওয়া সত্ত্বেও প্রতিবাদ না করা।

পরিপূর্ণ ইলমের অধিকারী এক শ্রেণীর আলেম এমনও আছেন, যাদের রাত কাটে কিতাব মুতালাআয়, আর দিন কাটে গ্রন্থ রচনায়। শয়তান তাদেরকে ধারণা দেয় যে, এর দ্বারাতো দীনের বেশ প্রচার হচ্ছে। তবে ক্রমান্বয়ে শয়তান ধোঁকার কৌশল পরিবর্তন করে। ফলে তাদের আভ্যন্তরীণ উদ্দেশ্য হয় লোকসমাজে আলোচিত হওয়া, খ্যাতি-সুখ্যাতি উঁচু হওয়া, নেতৃত্বের আসনে সমাসীন হওয়া এবং লেখকের

নিকট দূরদূরান্ত হতে লোকজনের আগমন ঘটা।

এ ক্ষেত্রে শয়তানের ধোঁকা বুঝার উপায় হলো, যদি মানুষ তার গ্রন্থ দ্বারা দিধাহিনভাবে উপকৃত হয় কিংবা ইলমে তার সমকক্ষ কারো সামনে তা পড়ে শুনানো হয় এবং গ্রন্থকারের নাম উল্লেখ করা না হয় তবুও সে আনন্দিত হবে, যদি তার উদ্দেশ্য হয় ইলমের প্রচার-প্রসার।

আমাদের পূর্বসূরি কতক আহলে ইলম বলেন, ইলমের কোন অধ্যায় আমার জানা হলে আমি পসন্দ করি যে, মানুষ যেন তা আমার থেকে শিখে উপকৃত হয়, কিন্তু শিখার বিষয়টি আমার দিকে সম্পৃক্ত না করে।

এই শ্রেণীর আলেমদের কতক এমনও আছেন, যারা অনুসারীদের আধিক্যদ্বারা আনন্দিত হন। আর শয়তানও তাদের মনে এ ধারণা দেয় যে, এই আনন্দতো ইলম অন্বেষণকারীদের আধিক্যের কারণে, যা দোষণীয় নয়। অথচ তার আভ্যন্তরীণ উদ্দেশ্য হয় ছাত্রের আধিক্য দ্বারা চতুর্দিক্ক তার সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়া।

এ ক্ষেত্রে শয়তানের ধোঁকা বুঝার উপায় হলো, যদি আগত ছাত্রদের কেউ তার চে' অধিক ইলমের অধিকারী কোন আলেমের দরবারে চলে যায় তাহলে তার মন ব্যথিত হয়; অথচ এটা কোন মুখলিস ওস্তাদের বৈশিষ্ট হতে পারে না। কেননা মুখলিস ওস্তাদের উদাহরণতো ঐসব ডাক্তারের ন্যায় যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় রুগিদের চিকিৎসা করেন। যদি কোন রুগি তাদের অনুরূপ কোন ডাক্তারের চিকিৎসায় সুস্থতা লাভ করে তাহলে অন্য ডাক্তারও আনন্দিত হন।

আবদুর রহমান বিন আবু লায়লা বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের একশত বিশজন আনছার সাহাবীর সাক্ষাৎ পেয়েছি, কোন লোক যদি তাদের কাউকে কোন বিষয়ে

জিজ্ঞেস করতো তাহলে সে মনে করতো যে, এ বিষয়ে সমাধানের জন্য আমার আনসারী ভাই যথেষ্ট, আর যদি কোন হাদীস বর্ণনা করতো তাহলে সে মনে করতো যে, এ হাদীস বর্ণনার জন্য আমার আনসারী ভাই যথেষ্ট।

অন্য রেওয়ায়েতে আবদুর রহমান বিন আবু লায়লা বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের একশত বিশজন সাহাবীর সাক্ষাৎ পেয়েছি, কোন লোক যদি তাদের কাউকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করতো তাহলে সে অন্য সাহাবীর নিকট পাঠিয়ে দিত, আর সেই সাহাবী আরেক সাহাবীর নিকট পাঠিয়ে দিত, এভাবে লোকটি জিজ্ঞেস করতে করতে প্রথম সাহাবীর নিকট পূনরায় উপস্থিত হতো।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, পরিপূর্ণ ইলমের অধিকারী ওলামায়ে কেরাম কখনো কখনো শয়তানের বাহ্যিক ধোঁকা হতে নিস্কৃতি পান, কিন্তু শয়তান তাদেরকে সুক্ষ্ম কৌশলে ধোঁকা দেয়। সে তাদেরকে বলে, তোমার মতো মহান ব্যক্তি আমি দেখিনি। তোমার মাঝে আসা যাওয়ার কোন রাস্তা আমার পরিচিত নয়। শয়তানের এ কথায় যদি সে স্বস্তি অনুভব করে তাহলে দম্ভ-অহঙ্কারে তার ধ্বংস অনিবার্য।

সারী সাক্বাতী বলেন, যদি কোন ব্যক্তি এমন বাগানে প্রবেশ করে যাতে আল্লাহর সৃষ্ট সব ধরনের গাছ রয়েছে এবং ঐসব গাছের ডালে আল্লাহর সৃষ্ট সব ধরনের পখি রয়েছে এবং প্রত্যেক পাখি যদি নিজ নিজ ভাষায় তাকে বলে, আস সালামু আলাইকা ইয়া ওলিয়্যাল্যাহ! আর তখন যদি সে তাদের কথায় স্বস্তি অনুভব করে তাহলে যেন সে তাদের হাতে বন্দি হয়ে গেলো। আল্লাহ তায়ালাই সঠিক পথে পরিচালিত করেন, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই।

নবম অধ্যায়

রাজা-বাদশাহ ও শাসনকর্তাদের উপর শয়তানের নেকচক্রান্তের বিবরণ

শয়তান রাজা-বাদশাহ ও শাসনকর্তাদেরকে ধোঁকা দেয়ার জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে। এখানে শয়তানের বড় ধরনের কতিপয় কৌশল উল্লেখ করছি।

প্রথম কৌশলঃ

শয়তান তাদের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল করে যে, তারা আল্লাহর প্রিয় বান্দা, কেননা তারা যদি আল্লাহর প্রিয় না হতেন তাহলে আল্লাহ তাদেরকে বাদশাহী দান করতেন না এবং বান্দাদের মাঝে নেতৃত্বদানের জন্য তাদেরকে আল্লাহর প্রতিনিধি বানাতেন না।

এ ক্ষেত্রে শয়তানের ধোঁকা বুঝার উপায় হলো, তারা যদি প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর প্রতিনিধি হয় তাহলে যেন শরীয়ত মোতাবেক দেশ পরিচালনা করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে চলে, তাহলে আল্লাহর আনুগত্যের কারণে তারা আল্লাহর প্রিয় হবেন।

পক্ষান্তরে দুনিয়ার বাদশাহী ও রাজত্ব এমন একটি বিষয় যা আল্লাহ এমন অনেককে দিয়েছেন যাদেরকে তিনি ঘৃণা করেন। দুনিয়ার ধন-দৌলতের দ্বার এমন অনেকের জন্য খুলে দিয়েছেন যাদের প্রতি তিনি করুণার দৃষ্টিতে তাকান না। আবার এদের একদলকে ক্ষমতা দিয়েছেন আল্লাহর ওলী-আউলিয়াদের উপর জুলুম-নির্যাতনের, ফলে তারা হত্যা করেছে তাদের অনেককে, আবার পরাভূত করেছে তাদের কতককে। ফলে আল্লাহপ্রদত্ত ক্ষমতা উপকারের পরিবর্তে তাদেরকে ঠেলে দিয়েছে ধ্বংসের অতল গহ্বরে। তদুপরি তারা দলভুক্ত হয়েছে আল্লাহর ঘোষিত পাপিষ্ঠদের কাতারে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, إنما نملى لهم ليزدادوا إثما অর্থঃ আমিতো খোদাদ্রোহীদেরকে সুযোগ এ জন্যই দেই যেন তাদের গুনাহ বৃদ্ধি পায়।

দ্বিতীয় কৌশলঃ

শয়তান তাদেরকে বলে, দেশের ক্ষমতা এখন তোমাদের হাতে, সুতরাং তোমাদের উচিৎ এমন প্রভাব প্রকাশ করা যাতে মানুষ তোমাদের অনুগত হয়। ফলে তারা অহঙ্কারবশতঃ ইলম অন্বেষণ ও আলেমদের সাহচর্য থেকে বিরত থেকে নিজেদের পরকাল বরবাদ করে। অথচ এ বিষয়টিতো পরিষ্কার যে, মানুষ যাদের সঙ্গ গ্রহণ করে তাদের গুণ-বৈশিষ্ট তার মাঝে প্রবেশ করে। সুতরাং যদি সে এমন ব্যক্তির সঙ্গ গ্রহণ করে যে দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে প্রভাবিত, ধর্মের বিধি-বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ, তাহলে তার মন্দ বৈশিষ্টগুলো তার মাঝে প্রবেশ করবে। তদুপরি সে তাকে বলবেনা এমন পথ অবলম্বনের যাতে তার কল্যাণ নিহিত এবং সতর্ক করবেনা এমন পথে পরিচালিত

হতে যা তার জন্য ক্ষতিকর, ফলে তার সঙ্গ গ্রহণ হবে অনন্তকালের সুখবঞ্চিত হওয়ার অন্যতম কারণ।

তৃতীয় কৌশলঃ

শয়তান তাদেরকে শত্রুর ভয় দেখায় এবং পাহাড়াদারী মজবুত করার নির্দেশ দেয়, ফলে মজলুম তাদের নিকট যুলুম পেশ করার সুযোগ পায়না এবং জুলুম বন্ধের কোন উদ্যোগও এসব রাজা-বাদশাহরা গ্রহণ করেনা। অনন্তর তারা সম্মুখীন হয় এমন বিপদের যে সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, من ولاه الله شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله عنه يوم القيامة دون حاجته وخلته وفقره অর্থঃ মুসলমানদের কোন বিষয়ে আল্লাহ যাকে কর্তৃত্ব অর্পণ করেছেন, সে যদি অবজ্ঞাবশত তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে তাদের প্রয়োজন উপস্থাপনের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে তাহলে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেন না এবং তাদের কোন প্রয়োজন পুরা করবেন না।

চতুর্থ কৌশলঃ

সে রাজা-বাদশাহদের নির্দেশ দেয় রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালনে এমন লোক নিযুক্ত করার যাদের না আছে দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা না আছে শরীয়তের জ্ঞান আর না আছে আল্লাহ তায়ালার ভয়; ফলে জনগণের উপর জুলুম-নির্যাতনের কারণে তারা মানুষের বদদোয়া হাসিল করে, ক্রয়-বিক্রয়ে শরীয়ত বিরোধী নীতি নির্ধারণ করে তারা মানুষের জন্য

হারাম রিজিকের ব্যবস্থা করে এবং এমন ব্যক্তির উপর শাস্তি প্রয়োগ করে যার উপর শাস্তি অবধারিত নয়।

অথচ এসব রাজা-বাদশাহরা ধারণা করে যে, তারা জনগণের দায়িত্ব অন্যের উপর অর্পণ করেই আল্লাহর পাকরাও থেকে মুক্তিলাভ করেছে, চাই তাদের কর্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তি ন্যায় প্রতিষ্ঠা করুক চাই না করুক। অসম্ভব, তারা যা ধারণা করছে তা নিতান্তই ভুল।

পঞ্চম কৌশলঃ

নিজেদের মতানুসারে কাজ করাকে শয়তান তাদের নিকট উত্তম করে তোলে। ফলে তারা এমন ব্যক্তির হাত কর্তন করে যা শরীয়ত সম্মত নয়, এমন ব্যক্তিকে হত্যা করে যাকে হত্যা করা বৈধ নয়, আর ইবলিস তাদেরকে ধারণা দেয় যে, রাজনীতির খাতিরে এরূপ করা বৈধ। আর তারাও মনে করে যে, শরীয়তে এ বিষয়ে অপূর্ণতা রয়েছে, তাই তা পূর্ণ করা প্রয়োজন। সুতরাং আমরা শরীয়তে পূর্ণতা দান করছি।

এসব রাজা-বাদশাহদের জেনে রাখা উচিত যে, তারা যা ধারণা করছে এবং কার্যত যা বাস্তবায়ন করছে তা শয়তানের জঘন্যতম চক্রান্ত। কেননা শরীয়ত হচ্ছে ঐশী নীতিমালা, আর এটাতো অসম্ভব যে, আল্লাহর নীতিমালায় কোনরূপ ত্রুটি থাকবে, আর তা পূর্ণ করতে মানুষের নীতি প্রয়োগ করার প্রয়োজন হবে!

আল্লাহ তায়ালা বলেন, مافرطنا في الكتاب من شيء অর্থঃ আমি কোরআনে মানুষের প্রয়োজনীয় কোন বিষয় বর্ণনা করতে ত্রুটি করি নি।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, لا معقب لحكمه অর্থঃ আল্লাহর বিধানে হ্রাস-বৃদ্ধি করার ক্ষমতা কারো নেই।

সুতরাং যারা রাজনৈতিকভাবে কোন নীতি নির্ধারণের পদক্ষেপ গ্রহণ করে তারাতো প্রকারান্তরে এ কথার দাবিদার যে, শরীয়ত অসম্পূর্ণ। অথচ তারা যা ধারণা করছে তা এক প্রকার কুফরী মতবাদ।

বাদশাহ আদুদ দাওলার ঘটনাতো এমন, তিনি এক বাঁদীর প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন, ফলে সর্বদা মনে তার চিন্তা ঘুরপাক খেত। তাই একদিন তিনি বাঁদীকে চুবিয়ে মারার নির্দেশ দিলেন, যেন রাষ্ট্র পরিচালনায় তার মন উদাসীন না হয়। এটাতো এমন পাগলামি যার নযীর ইতিহাসে নেই। কেননা বিনা অপরাধে মুসলমান হত্যার বৈধতা শরীয়তে নেই, আর তা বৈধ মনে করাতো কুফরী।

আর যদি তার অবৈধতা বিশ্বাস করে, কিন্তু রাষ্ট্রের জন্য কল্যাণকর বিবেচনায় তা বাস্তবায়ন করে তাহলে জেনে রাখা উচিত যে, শরীয়তের বিরোধিতা কোন কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না।

ষষ্ঠ কৌশলঃ

জনগণের সম্পদ দ্বারা বিলাসী জীবনযাপন এবং আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত হতে শয়তান তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে, আর তাদের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল করে যে, এসব সম্পদতো তোমাদেরই আয়ত্তাধীন; সুতরাং তা ব্যবহারের স্বাধীনতা তোমাদের রয়েছে।

নেতৃস্থানীয় এসব ব্যক্তিবর্গের জেনে রাখা উচিত যে, তারা যে ধারণার বশীভূত হয়ে জনগণের মাল আত্মসাৎ করছেন তা শয়তানের গভীর চক্রান্ত। কেননা শরীয়ততো নিজের সম্পদ ব্যবহারেও মিতব্যয়ী হওয়ার নির্দেশ প্রদান করে, তাহলে ঐ ব্যক্তির অবস্থা কিরূপ হওয়া

উচিত জনগণের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণে যাকে নিযুক্ত করা হয়েছে! সুতরাং মনযোগ দিয়ে শুনুন, রাষ্ট্রের সম্পদ আপনি ততটুকু ভোগ করতে পারেন যতটুকু পরিশ্রম তাতে আপনার ব্যয় হয়, এতে বিলাসিতার সুযোগ শরীয়তে নেই।

একদিন হাম্মাদ ওয়ালিদ বিন ইয়াযিদকে কয়েক লাইন কবিতা শুনালে ওয়ালিদ তাকে উপহার স্বরুপ দু'টি বাঁদী ও পঞ্চাশ হাজার দিরহাম হাদীয়া দেয়। আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেন, যদিও এ ঘটনাটি তার প্রশংসার উদ্দেশ্যে বর্ণনা করা হয় কিন্তু তার এ কাজটি জঘন্যতম অপরাধ, কেননা সে মুসলমানদের সম্পদ অপব্যবহার করেছে।

সপ্তম কৌশলঃ

শয়তান তাদেরকে অপকর্মের ক্ষেত্রে বেপরোয়া হতে উদ্বুদ্ধ করে। সে তাদের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল করে যে, দেশের নিরাপত্তা ও রাস্তা-ঘাটের সংস্কার তোমাদেরকে এসব গুনাহের শাস্তি থেকে রক্ষা করবে। তাদের এসব অমূলক ধারণার জবাব হলো, দেশের নিরাপত্তা ও রাস্ত া-ঘাট সংস্কারের উদ্দেশ্যেই তাদেরকে নিযুক্ত করা হয়েছে, এসব দায়িত্বপালনতো তাদের উপর ওয়াজিব। আর তারা যে পরোয়াহীন পাপকর্মে লিপ্ত হয় তাতো শরীয়তে নিষিদ্ধ। সুতরাং যে দায়িত্বপালন তাদের উপর ওয়াজিব তা কিভাবে তাদের গুনাহমাফের উছিলা হবে!

অষ্টম কৌশলঃ

যদি রাষ্ট্রের কেউ অপরাধ করে কিংবা সম্পদে খেয়ানত করে তাহলে বেত্রাঘাত ও শাস্তি প্রয়োগের মাধ্যমে অপরাধস্বীকার ও সম্পদ বের করতে শয়তান তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে, অথচ এটা শরীয়ত সমর্থিত

পন্থা নয়; বরং শরীয়তের বিধান হলো, অপরাধী ও খেয়ানতকারীর বিপক্ষে যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ পেশ করা।

ওমর বিন আবদুল আজীজের ঘটনাতো এমন, এক গভর্নর পত্র মারফত তাকে অবহিত করলো যে, এখানকার এক সম্প্রদায় আল্লাহর মালে খেয়ানত করেছে। তাদের উপর শাস্তি প্রয়োগ ব্যতীত সে মাল দখল করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তখন পত্রের জব্যবে ওমর লিখেন, তাদের রক্ত নিয়ে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার চে' আল্লাহর সামনে তাদের খেয়ানত পেশ করা আমার নিকট অধিক প্রিয়।

নবম কৌশলঃ

সে তাদেরকে মানুষের সম্পদ জবরদখলের পর সদক্বা করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং তাদের মনে এ ধারণা দেয় যে, আল্লাহর রাস্তায় তোমার সদকা করা সম্পদ জবরদখলের ক্ষতিপূরক হবে। আর সে এ কথাও বলে, আল্লাহর পথে এক দিরহাম সদক্বা করা দশবার জবরদখলের ক্ষতিপূরক।

তাদের জেনে রাখা উচিত যে, শয়তান তাদের মনে যে ধারণা দেয় তা একটি অসম্ভব বিষয়; কেননা অন্যের সম্পদ জবরদখল এমন একটি গুনাহ যা সদক্বা দ্বারা মাফ হয়না, যতক্ষণনা হক্বদার তা মাফ করেন। আর সদক্বা যদি জবরদখলের মাল থেকে দেয়া হয় তাহলে তা কবুল হবেনা, আর যদি হালাল সম্পদ থেকে দেয়া হয় তবুও তা জবরদখলের গুনাহের ক্ষতিপূরক হবেনা। কেননা ফকিরকে দান করা অন্যের হক্ব আদায়ের সমার্থক নয়।

দশম কৌশলঃ

শয়তান তাদেরকে অপকর্মে লেগে থাকার পাশাপাশি নেককারদের যিয়ারত ও তাদের থেকে দোয়া নিতে উদ্বুদ্ধ করে, আর তাদের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল করে যে, এসবের দ্বারা অপকর্মের গুনাহ মোচন করা হবে। অথচ তাদের এ নেককর্ম তাদের বদকর্মের গুনাহ প্রতিহত করার ক্ষমতা রাখে না।

হুসাইন বিন যিয়াদ বলেন, আমি মানি' কে বলতে শুনেছি, এক ব্যাবসায়ী কতক ট্যাক্স আদায়কারীর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তারা তার জাহাজ আটকে রাখে। ব্যবসায়ী মালেক বিন দীনারের নিকট গমন করে পূর্ণ ঘটনা খুলে বললে তিনি পায়ে হেঁটে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। লোকেরা তাকে দেখে বললো, হে আবু ইয়াহইয়া, (মালেক বিন দীনারের উপনাম) আপনার প্রয়োজনে আমাদের নিকট কাউকে পাঠালেই হতো! তিনি বললেন, আমার প্রয়োজন হচ্ছে তোমরা এই লোকের জাহাজ নিরাপদে ফিরিয়ে দাও। তারা বললো, আমরা আপনার কথা মানলাম এবং নিরাপদে তার জাহাজ ফিরিয়ে দিলাম।

এদের সাথে একটি মগ ছিলো, মানুষ থেকে যে দিরহাম তারা ট্যাক্স হিসাবে নিত তা এই মগে জমা করতো। তারা বললো, হে আবু ইয়াহইয়া! আমাদের জন্য দোয়া করুন। তিনি বললেন, মগের নিকট দোয়া চাও, মগ তোমাদের জন্য দোয়া করবে। তোমাদের জন্য দোয়া আমি কিভাবে করবো, অথচ হাজার মানুষ তোমাদের জন্য বদদোয়া করছে! তোমরা কী মনে করো যে, আল্লাহ এক ব্যক্তির ডাকে সাড়া দিবেন, আর হাজার লোককে উপেক্ষা করবেন!

এগারোতম কৌশলঃ

নেতৃস্থানীয় লোকদের কতক এমনও আছেন, যারা উর্ধ্বতন নেতার আদেশে অন্যের উপর জুলুম করে, আর শয়তান তাদের মনে এ ধারণা দেয় যে, তুমি যুলুম-নিপীড়ন নিশ্চিন্তে চালিয়ে যাও, কেননা যুলুমের গুনাহ আদেশদাতার আমলনামায় জমা হবে – তুমি এ থেকে সম্পূর্ণ দায়মুক্ত।

তাদের জেনে রাখা উচিত যে, শয়তান তাদের মনে যে ধারণা দেয় তা এক গভীর ষড়যন্ত্র; কেননা সেতো জুলুমের সহযোগী, আর নাফরমানীতে সাহায্যকারী প্রত্যেক ব্যক্তি নাফরমান হিসাবে গণ্য হবে। কেননা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদের ক্ষেত্রে দশ ব্যক্তির উপর লা'নত করেছেন, তাদের একজন হলো মদপানে সাহায্যকারী। অনুরুপভাবে যে ব্যক্তি যুলুমের সরঞ্জাম সরবরাহ করে সেও যুলুম বাস্তবায়নে সাহায্যকারী হিসাবে গণ্য হবে।

জা'ফর বিন সোলায়মান বলেন, আমি মালেক বিন দীনারকে বলতে শুনেছি, মানুষের খেয়ানতকারী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে কোন খেয়ানতকারীকে সাহায্য করবে। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন।

দশম অধ্যায়

সুফিদের উপর শয়তানের ষড়যন্ত্রের বিবরণ

আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেন, সুফিগণ জাহেদদেরই একটি শ্রেণী, আর জাহেদদের উপর শয়তানের ধোঁকাদানের বিবরণ আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। তবে কিছু বৈশিষ্ট, অবস্থা ও নিদর্শনের কারণে সুফিরা জাহেদদের থেকে পৃথক হয়েছেন, তাই আমরা পৃথক অধ্যায়ে তাদের পরিচয় তুলে ধরার প্রয়োজন অনুভব করছি।

সুফিদের পরিচয়

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় তার অনুসারীদের নিসবাত ছিলো ইমান ও ইসলামের সাথে, তাই তাদের উপাধি ছিলো মুসলিম ও মুমিন। অতঃপর ক্রমান্বয়ে মানুষ এবাদত-বন্দেগীতে একএক পদ্ধতি অবলম্বন করে নিজেদেরকে একেক উপাধিতে ভূষিত করে।

তাদের এক সম্প্রদায়ের অবস্থা এমন, যারা দুনিয়ার ভোগসামগ্রী বর্জন করে নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র এবাদতে নিবেদন করে। আর এ ক্ষেত্রে তারা এমন পন্থা অবলম্বন করে যার নযীর অতীত যামানায় অবিদ্যমান, এমন বৈশিষ্ট উদ্ভাবন করে জনসাধারণকে যা করে মুগ্ধপ্রাণ।

এসব পন্থা অবলম্বনে যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম মসজিদুল হারামের নিকটবর্তী স্থানে আল্লাহ্‌র খেদমতে ও এবাদত-বন্দেগীতে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন তিনি গওছ বিন মুর। অবশ্য লোকসমাজে তিনি সুফা নামে পরিচিত ছিলেন। তাই পরবর্তীকালে এবাদত-বন্দেগীতে এসব রীতি-নীতি ও কর্মকান্ডে যারা তার অনুসরণ করে তাদেরকেই সুফি বলে।

আর গওছ বিন মুরকে সুফা বলার কারণ হলো, প্রথম দিকে তার মায়ের কোন সন্তান জীবিত থাকতো না, তাই একদিন তিনি মান্নত করলেন যে, আমার কোন সন্তান যদি জীবিত থাকে তাহলে তার মাথায় একগুচ্ছ সুফ (পশম) বেঁধে তাকে কাবা গৃহের খাদেম নিযুক্ত করবো। তখন গওছ বিন মুর জন্মগ্রহণ করে জীবিত থাকলে তিনি কৃত মান্নত অনুযায়ী তার মাথায় একগুচ্ছ পশম বেঁধে দেন, আর সেই থেকেই তাকে সুফা বলা হয় এবং তার বংশধর ও অনুসারীদেরকে সুফি বলা হয়।

আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেন, এক সম্প্রদায়ের অভিমত হলো, তাসাওউফের নিসবত আহলে সুফ্‌ফার সাথে। আর তাদের এ অভিমতের কারণ হলো, আল্লাহ্‌র এবাদতে নিজেকে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ ও দারিদ্র জীবনযাপনে সুফা ও আহলে সুফ্‌ফার অবস্থা সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিলো। কেননা আহলে সুফ্‌ফার সকলেই ছিলেন দরিদ্র এবং তারা সর্বদাই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া

সাল্লামের দরবারে পড়ে থাকতেন। তাদের না ছিলো সম্পদ না ছিলো পরিবার। তখন মসজিদে নববীর একপাশে তাদের জন্য একটি সুফ্ফা (ছাপরা ঘর) তৈরি করা হলে তারা সেখানে অবস্থান করেন এবং সেই থেকে তাদেরকে আহলে সুফ্ফা বলা হয়।

আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেন, আহলে সুফ্ফার এ মোবারক জামাত প্রয়োজনের তাগিদে মসজিদে অবস্থান করতেন এবং অভাবের তারণায় সদকার মাল ভক্ষণ করতেন। তাই মুসলমানরা যখন বিজয়ী হন এবং তাদের অবস্থা সচ্ছল হয় তখন আহলে সুফ্ফার উল্লিখিত অবস্থা পরিবর্তন হয়।

আর আহলে সুফ্ফার সাথে সুফিদের নিসবত, এটা ভুল নিসবত। কেননা যদি বিষয়টি এমনই হতো তাহলে তাদেরকে সুফ্ফি বলা হতো – সুফি নয়।

সুফিদের আবির্ভাব

আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেন, আজ থেকে দু'শ বছর পূর্বে সুফি শব্দের উৎপত্তি হয়। সুফি শব্দের প্রবর্তক যারা তারা সুফির গুণাগুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, সুফি এমন ব্যক্তিকে বলা হবে, যে মন্দ স্বভাব পরিহার এবং দুনিয়া বিমুখতা, ধৈর্য-সহনশীলতা, এবাদতে আন্ত রিকতা ও কথায় সত্যবাদিতাসহ এমনসব উত্তম গুণাবলি অর্জনে নিজেকে আত্মনিয়োগ করবে যা দুনিয়াতে উত্তম প্রশংসা ও আখেরাতে মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ হবে।

আবু বকর বিন মুছাক্বিফ বলেন, আমি জুনাঈদ বিন মুহাম্মদকে তাসাওউফ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন তাসাওউফ হলো, সকল মন্দ স্বভাব পরিহার করা এবং যাবতীয় উত্তম গুণাবলি অর্জন করা।

আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেন, প্রথম দিকের সুফিদের মাঝে এসব গুণাবলি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিলো। অতঃপর ক্রমান্বয়ে ইবলিস তাদের পরবর্তী প্রজন্মকে বিভিন্ন বিষয়ে ধোঁকাগ্রস্ত করে। এভাবে দিন যত অতিবাহিত হয় ইবলিসের ধোঁকার কৌশল ততই ভয়াবহ আকার ধারণ করে। একপর্যায়ে বর্তমান প্রজন্মের উপর ইবলিস তার ধোঁকার জাল ইচ্ছাস্বাধীন ছড়িয়ে দেয়।

এসব সুফিদেরকে ইবলিস সর্ব প্রথম যে বিষয়ে ধোঁকা দেয় তা হচ্ছে সে তাদেরকে ইলম অর্জন থেকে বিমুখ করে এবং তাদের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল করে যে, ইলমের উদ্দেশ্যতো আমল; তাই আমলকে ইলমের উপর প্রাধান্য দেয়া উচিত।

সুতরাং শয়তানের ধোঁকা যখন তাদের উপর বাস্তবায়িত হয় এবং ইলমের নূর তাদের থেকে বিলুপ্ত হয় তখন তারা নানামুখী অন্ধকারে হাবুডুবু খেতে শুরু করে। ফলে তাদের কেউ ধারণা করে যে, তাসাওউফের উদ্দেশ্য হচ্ছে দুনিয়ার ভোগসামগ্রি সর্বাত্মকরূপে পরিহার করা। তাই তারা এমন বস্তু বর্জন করে যা দেহ সুস্থ থাকার জন্য অপরিহার্য।

তারা সম্পদকে বিচ্ছুর সাথে তুলনা করে এবং এ বিষয়টি বিস্মৃত হয় যে, তাদের কল্যাণার্থেই সম্পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। তারা নিজেকে এমনসব সাধনায় আত্মনিয়োগ করে যা দেহের ধারণ ক্ষমতার উর্ধ্বে। তাদের কতকের অবস্থা এমন, যারা কখনো শয়ন করে না। এসব সুফিদের উদ্দেশ্য যদিও সৎ কিন্তু সাধনা-মোজাহাদায় যে পথ তারা অবলম্বন করছে তা অত্যন্ত ভুল।

তাদের কতকের অবস্থা এমন, যারা জ্ঞান স্বল্পতার দরুন এমনসব হাদীসের উপর আমল করে যা সম্পূর্ণ বানোয়াট।

ধন-সম্পদ বর্জনের ক্ষেত্রে সুফিদেরকে শয়তানের ধোঁকাদানের বিবরণ

দুনিয়া বিমুখতায় প্রথম যুগের সুফিদের নিয়্যাত সৎ হওয়ায় ইবলিস তাদের সামনে মালের দোষ তুলে ধরতো এবং তার অনিষ্টের ভয় দেখাতো। ফলে তারা মাল বর্জন করে দরিদ্র জীবন অতিবাহন করতো। তাদের উদ্দেশ্য যদিও সৎ ছিলো কিন্তু জ্ঞান স্বল্পতার দরুন তারা ভুল কাজে লিপ্ত হতো।

এতো প্রথম যুগের সুফিদের অবস্থা, পক্ষান্তরে যারা এ যামানার সুফি তাদেরকে ধোঁকা সরবরাহে শয়তান অব্যাহতি নিয়েছে। কেননা পূর্ব যামানার ধোঁকাগ্রস্ত সুফিদের অনুসরণে তারা নিজেদের মালিকানাধিন সমুদায় সম্পত্তি সদক্বা করে পরিবার-পরিজন ও নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়।

আবু নছর তুসী বলেন, আমি রায় নগরীর কতক মাশায়েখকে বলতে শুনেছি, আবু আবদুল্লাহ মাকরী ওয়ারিছ সূত্রে তার পিতা থেকে স্থাবর সম্পত্তি ছাড়াও পঞ্চাশ হাজার দীনার লাভ করেন। অতঃপর যাবতীয় সম্পদ গরীবদের উপর খরচ করে তিনি কপর্দকশূন্য হয়ে যান। এ জাতীয় বহু ঘটনা কিতাবের পাতায় বর্ণিত হয়েছে।

যারা এমনটি করেন আমরা মুতলাক্বভাবে তাদের নিন্দা করবোনা। যদি তারা পরিবার-পরিজন ও নিজের খরছ বাবদ প্রয়োজন পরিমাণ সম্পদ রেখে অতিরিক্ত সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে দেন, অথবা তার যদি এমন পেশা থাকে যা তাকে মানুষের দ্বারস্থ হতে নিবৃত্ত করে, অথবা তার মাল যদি সন্দেহযুক্ত হয় এবং সে তা গরীব-দুঃখীদের উপর সদক্বা করে দেয় তাহলে তার এ কাজ শরীয়তের দৃষ্টিতে প্রশংসিত – নিন্দিত নয়।

পক্ষান্তরে সে যদি তার সন্দেহমুক্ত সমুদায় হালাল সম্পদ দান করে পরিবারকে অভাবের মুখে ঠেলে দিয়ে নিজেও মানুষের দ্বারস্থ হয় তাহলে আমরা তার এ কাজের তীব্র নিন্দা জানাবো। কেননা এর দ্বারা সে সাথী-সঙ্গীদের অনুগ্রহ, তাদের সদক্বার মাল ভক্ষণ অথবা জালেমদের সন্দেহযুক্ত মালের মুখাপেক্ষী হবে, যা শরীয়তে নিন্দিত এবং শরীয়ত এ বিষয়ে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে।

অবশ্য যেসব সুফিরা জ্ঞানস্বল্পতার দরুন এমনটি করেন তাদের বিষয়টি অদ্ভুত নয়, বরং অদ্ভুত হলো ঐসব সুফিদের বিষয় যারা বিবেকবান ও শরীয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া সত্ত্বেও মানুষকে এ বিষয়ে উৎসাহ দেন এবং তাদেরকে তা বাস্তবায়নের নির্দেশ দেন, অথচ আক্বল ও শরীয়তের সাথে তা সংঘর্ষপূর্ণ।

হারেছ মুহাসেবীতো এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন এবং আবু হামেদ গাজ্জালীর মতো বিখ্যাত আলেম তার সমর্থন করে এ বিষয়ে মদদ যুগিয়েছেন।

অবশ্য আমার নিকট হারেছ মুহাসেবী আবু হামেদ গাজ্জালী থেকে অধিক ওজরগ্রস্ত। কেননা আবু হামেদ ছিলেন শরীয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে হারেছ মুহাসেবী থেকে অধিক জ্ঞানী ব্যক্তি, তবে তাসাওউফ শাস্ত্রে তার অনুপ্রবেশ হারেছ মুহাসেবীকে সমর্থন যুগিয়েছে।

মালের বিষয়ে হারেছ মুহাসেবী মুফতি সাহেবদের সম্বোধন করে বলেন, হে মুফতী সম্প্রদায়! আপনারা যে মালের বিষয়ে বলেন হালাল মাল জমা করা তা বর্জন করা থেকে উত্তম, এ কথার দ্বারাতো আপনারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও অন্যান্য নবী-রাসুলদের অবজ্ঞা করছেন এবং এ দাবি করছেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতের জন্য কল্যাণকামী নন, যেহেতু মাল জমা করা তাদের জন্য উত্তম হওয়া

সত্ত্বেও তিনি তাদেরকে তা জমা করা থেকে নিষেধ করেছেন।

তদুপরি আপনারা এ দাবিও করছেন যে, স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামিনও তার বান্দাদের কল্যাণ চান না, যেহেতু তিনিও সম্পদ জমা করা থেকে বান্দাদের নিষেধ করেছেন; অথচ তিনি জানেন যে, মাল জমা করা তাদের জন্য উত্তম।

আর সাহাবাদের সম্পদ দ্বারা দলীল পেশ করা আপনাদের জন্য ফলপ্রসু নয়। কেননা সাহাবী আবদুর রহমান বিন আউফতো অঢেল সম্পদের মালিক ছিলেন। তার ইন্তেকালের পর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের কতক সাহাবী বললেন, আবদুর রহমান বিন আউফের (রা.) রেখে যাওয়া সম্পদের কারণে তার ব্যাপারে আমাদের আশঙ্কা হয়। তখন কা'ব (রা.) বললেন, সুবহানাল্লাহ; তোমরা আবদুর রহমান বিন আউফের ব্যাপারে কিসের আশঙ্কা করছো? তিনি হালাল পন্থায় মাল উপার্জন করেছেন এবং তা আল্লাহর পথে খরচ করেছেন।

কা'বের (রা.) এ কথা সাহাবী আবু যরের (রা.) কানে পৌঁছলে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে কা'বের সন্ধানে বের হন। চলার পথে উটের চোয়ালের হাড় পেয়ে তিনি তা নিয়েই কা'বের সন্ধানে হাঁটতে থাকেন। তখন কা'বকে বলা হলো যে, আবু যর তোমাকে খুঁজতেছেন। একথা শ্রবণে কা'ব দ্রুত পলায়ন করে সাহাবী ওসমান বিন আফ্ফানের ঘরে উপস্থিত হয়ে তার নিকট সাহায্য কামনা করেন এবং পুরো ঘটনা বিস্তারিত খুলে বলেন। এদিকে আবু যরও কা'বের পদচিহ্ন অনুসরণ করে ওসমান বিন আফ্ফানের ঘরে উপস্থিত হন।

আবু যর গৃহে প্রবেশ করলে কা'ব তার ভয়ে ওসমানের পিছে অবস্থান নেন। তখন আবু যর তাকে বলেন, হে ইয়াহুদির বাচ্চা, তুমি নাকি

দাবি করো যে, আবদুর রহমান বিন আউফ যে সম্পদ রেখে গেছেন তাতে কোন সমস্যা নেই? ভালো করে শুনে রাখ, একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘর থেকে বের হয়ে বললেন, "الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا" অর্থঃ দুনিয়াতে যার সম্পদ বেশি আখেরাতে সে নিঃস্ব হবে, তবে যে গরীব-দুঃখীদের মাঝে সম্পদ খরচের নির্দেশ দিবে তার বিষয়টি ভিন্ন। অতঃপর বললেন, হে আবু যর! তুমি বেশি সম্পদের আশা করো আর আমি কম সম্পদের আশা করি।

তো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পদের ব্যাপারে এ কথা বলছেন, আর হে ইহুদির বাচ্চা! তুমি বলছো যে, আবদুর রহমান বিন আউফ যা রেখে গেছেন তাতে কোন সমস্যা নেই; তুমি মিথ্যা বলেছো এবং তোমার অনুরূপ কথা যে বলে সেও মিথ্যাবাদী। অতঃপর আবু যর সেখান থেকে চলে আসেন, কিন্তু কা'ব এসব কথার কোন উত্তর না দিয়ে চুপচাপ বসে রইলেন।

হারেছ মুহাসেবী আরো বলেন, এই যে আবদুর রহমান বিন আউফ, এতবড় শ্রেষ্ঠ সাহাবী হওয়া সত্ত্বেও কেয়ামতের ময়দানে তাকে দাঁড় করিয়ে রাখা হবে এবং মুহাজির গরীব সাহাবীদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করা থেকে বাঁধা প্রদান করা হবে, আর তিনি তাদের পিছে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে থাকবেন। এসবের একমাত্র কারণ, তিনি নিজেকে মানুষের দ্বারস্থ হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন এবং কল্যাণকর কাজে সম্পদ ব্যয় করার জন্য হালাল মাল উপার্জন করেছেন।

আর সাহাবাদের অবস্থাতো এমন ছিলো, তারা যখন আহারের মত কোন কিছু না পেতেন তখন খুশি হতেন। আর তুমিতো দারিদ্রতার ভয়ে সম্পদ জমা করছো এবং তা গুদামজাত করছো! আল্লাহর প্রতি

বদধারণা ও রিজিকের ব্যাপারে তার জিম্মাদারীর প্রতি অনাস্থার কারণেই তুমি এমনটি করছো।

আর মাল জমা করার আরেকটি ক্ষতিকর দিকতো এটাও যে, তুমি দুনিয়ার ভোগ-বিলাস, শোভা-সৌন্দর্য ও আনন্দ-ফুর্তির উদ্দেশ্যে মাল জমা করলে, অতঃপর তা যদি কোন কারণে তোমার হাতছাড়া হয়ে যায় তাহলেতো আক্ষেপ-অনুতাপে তোমার জীবন হয়ে উঠবে দুর্বিষহ। অথচ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, من أسف على دنيا فاتته قرب من النار مسيرة سنة অর্থঃ যে ব্যক্তি দুনিয়ার সম্পদ হাতছাড়া হওয়ার পর তার উপর আক্ষেপ করবে সে এক বৎসরের রাস্তা পরিমাণ জাহান্নামের নিকটবর্তী হবে। অথচ তোমার অবস্থাতো এমন, সম্পদ হাতছাড়া হওয়ার পর তার উপর আক্ষেপ করে তুমি আল্লাহর শাস্তির প্রতি উদাসিনতা প্রদর্শন করছো। ধিক তোমায়, তুমি কী এ যামানায় ঐরকম হালাল সম্পদ পাবে যেমনটি সাহাবায়ে কেরাম (রা.) তাদের যুগে পেয়েছেন!

সুতরাং হালাল সম্পদই যখন দুর্লভ তাহলে কিভাবে তুমি তা জমা করবে! মনোযোগ দিয়ে শোন, আমি তোমায় হিতোপুদেশ দিচ্ছি: তুমি জরুরত পরিমাণ সম্পদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে, সৎকাজে ব্যয় করার উদ্দেশ্যেও মাল জমা করবে না । কেননা এমন ব্যক্তি সম্পর্কে আহলে ইলমদের কাউকে জিজ্ঞেস করা হলো, যে সৎকাজে ব্যয় করার উদ্দেশ্যে মাল জমা করে; তিনি তখন বললেন, মাল বর্জন করা জমা করা থেকে উত্তম।

তিনি আরো বলেন, কতক যুগশ্রেষ্ঠ তাবেঈকে এমন দু' ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, যাদের একজন হালাল মাল অন্বেষণ করেছে এবং তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে দরবারে এলাহিতে উপস্থিত হয়েছে,

আর অন্য ব্যক্তির অবস্থা এমন, যে মাল অন্বেষণ করে নি এবং তা খরচও করে নি; সুতরাং এদের কোন ব্যক্তি উত্তম? তখন উক্ত তাবেঈ বললেন, আল্লাহর কসম; যে ব্যক্তি মাল উপার্জন থেকে বিরত রয়েছে সেই শ্রেষ্ঠ, আর শ্রেষ্ঠত্বের দিক দিয়ে উভয়ের মাঝে তেমন ব্যবধান, পৃথিবীর পূব-পশ্চিমের মাঝে যেমন ব্যবধান।

আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেন, এতক্ষণ যা আলোচিত হলো তা সব হারেছ মুহাসেবীর বক্তব্য। তার এ বক্তব্য আবু হামেদ গাজ্জালী (রহ.) উল্লেখ করেছেন এবং তার সমর্থন করেছেন, তদুপরি ছা'লাবার হাদীস দ্বারা তার বক্তব্যকে শক্তিশালী করেছেন। কেননা সা'লাবা অঢেল সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও সম্পদের যাকাত দেননি, অথচ তিনি ছিলেন রাসুলের সাহাবী।

আবু হামেদ গাজ্জালী বলেন, যে ব্যক্তি নবী-রাসুল ও আউলিয়াদের অবস্থা ও বক্তব্য পর্যবেক্ষণ করবে সে দিধাহিনচিত্তে এ কথা গ্রহণ করবে যে, মাল লাভ করা থেকে তা হাতছাড়া হওয়া উত্তম, যদিও তা কল্যাণকর কাজে ব্যয় করুক। যেহেতু মালের ব্যস্ততা মানুষকে আল্লাহর স্বরণ থেকে বিমুখ রাখে।

তাই মুরিদের জন্য উচিত প্রয়োজনাতীত মাল আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে মালের বেড়াজাল থেকে মুক্ত হওয়া। কেননা তার নিকট যদি একটি দিরহামও অবশিষ্ট থাকে যার দিকে মন ধাবিত হয় তাহলে সে আল্লাহর রহমত থেকে আড়াল হয়ে যাবে।

আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেন, আবু হামেদ গাজ্জালীর এ বক্তব্য শরীয়ত ও আক্কল বিরোধী, তদুপরি মালের উদ্দেশ্যের ব্যাপারে তা একটি মন্দ উপলব্ধি।

দলীল ভিত্তিক উল্লিখিত বক্তব্যের অসারতা

প্রথমেই আমাদের জেনে রাখা উচিত যে, স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মালের মর্যাদা বর্ণনা করেছেন এবং তা সংরক্ষণের আদেশ দিয়েছেন। যেহেতু সম্মানিত বনী আদমের উপজীব্য হিসাবে আল্লাহ মালকে নির্ধারণ করেছেন, তাই মালের মর্যাদা বর্ণনার অপেক্ষা রাখেনা।

মালের মর্যাদা বর্ণনায় আল্লাহ তায়ালা কোরআনে বলেন, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا অর্থঃ তোমরা নির্বোধ মালিকদের হাতে ঐ সম্পদ অর্পণ করো না যাকে আল্লাহ তোমাদের জীবন ধারণের উপজীব্য নির্ধারণ করেছেন।

অন্য আয়াতে আল্লাহ নির্বোধদের হাতে সম্পদ অর্পণে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে বলেন, فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ অর্থঃ যদি তাদের মাঝে ভালো-মন্দ বিচারের জ্ঞান অনুভব করো তাহলে তাদের সম্পদ তাদের নিকট ফিরিয়ে দাও।

হাদীস শরীফেও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পদ নষ্ট করা থেকে মুসলমানদের নিষেধ করেছেন। তিনি একদিন সাহাবী সা'দকে সম্বোধন করে বলেন, لأن تترك ورثتك أغنياء خير لك من أن تتركهم عالة يتكففون الناس অর্থঃ তুমি তোমার ওয়ারিশদেরকে স্বচ্ছল অবস্থায় রেখে যাওয়া তাদেরকে দারিদ্রাবস্থায় রেখে যাওয়া থেকে উত্তম, যেন তারা মানুষের দ্বারস্থ না হয়।

অন্য হাদীসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম

বলেছেন, ما نفعني مال كمال أبي بكر অর্থঃ আবু বকরের মাল আমাকে যতটুকু উপকৃত করেছে অন্য কারো মাল আমাকে সে পরিমাণ উপকার পৌঁছায়নি।

একটি মারফু' হাদীসে আমর বিন আস (রা.) বলেন,

بعث إلي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "خذ عليك ثيابك وسلاحك ثم ائتني" فأتيته فقال: "أني أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك وأرغب لك من المال رغبة صالحة" فقلت يا رسول الله ما أسلمت من أجل المال ولكني أسلمت رغبة في الإسلام فقال: "يا عمرو نعم المال الصالح للرجل الصالح"

অর্থঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোক মারফত আমাকে ডেকে বললেন, তুমি বর্ম পরিধান ও অস্ত্র ধারণ করে আমার নিকট আসো। তখন আমি তা পরিধান করে রাসুলের নিকট উপস্থিত হলে তিনি আমাকে বললেন, আমি তোমাকে এক সেনাদলের উদ্দেশ্যে পাঠাতে চাই, তুমি সেখানে পৌঁছলে আল্লাহ তোমাকে বিজয়ী করবেন এবং গনীমত দান করবেন। আর নেক উদ্দেশ্যে আমি তোমার জন্য সম্পদ কামনা করি। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আমিতো সম্পদ লাভের আশায় ইসলাম গ্রহণ করিনি, বরং আল্লাহর আনুগত্যে নিজেকে সপে দেয়ার উদ্দেশ্যেই আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে আমর! সৎলোকের জন্য হালাল মাল কতইনা উত্তম।

অন্য হাদীসে আনাস বিন মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার জন্য সর্ব প্রকার দোয়া করেছেন, আর দোয়ার শেষভাগে ছিলো, اللهم أكثر ماله وولده وبارك له অর্থঃ হে আল্লাহ, আপনি তার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দিন এবং তাকে বরকত দান করুন।

ওবায়দুল্লাহ বিন কা'ব বলেন, আমি কা'ব বিন মালেককে তার তাওবার হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। হাদীসের একাংশে তিনি বলেন, আমি বললাম হে আল্লাহর রাসুল! আমার কৃত অপরাধের তাওবা স্বরুপ আমি আমার সমুদায় সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় সদক্বা করবো। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি কিছু সম্পদ রেখে দাও, কেননা তা তোমার জন্য কল্যাণকর।

আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেন, উল্লিখিত হাদীসগুলো বর্ণিত হয়েছে হাদীসের বিশুদ্ধ গ্রন্থসমূহে; অথচ তা সুফিদের আক্বীদা-বিশ্বাস পরিপন্থী। কেননা তাদের আক্বীদা হলো, মালের আধিক্য আল্লাহর রহমতের অন্তরায়, তা এক প্রকার শাস্তি এবং তা সংরক্ষণ তাওয়াক্কুল পরিপন্থী।

তবে এ বিষয়টি অস্বীকারের কোনই সুযোগ নেই যে, মালে ফেতনার আশঙ্কা রয়েছে এবং ফেতনার কারণেই বহুলোক মালকে এড়িয়ে চলেছে। যেভাবে এক বিবেচনায় সম্পদ জমা করা উত্তম তদ্রুপ মালের ফেতনা অন্তরকে দিশেহারা করার ঝুঁকিও ভয়াবহ। তদ্রুপ মাল বিদ্যমান থাকাবস্থায় আখেরাতের স্বরণে অন্তর লিপ্ত থাকাও এক দুর্লভ ব্যাপার। একারণেই মালের ক্ষেত্রে ফেৎনার আশঙ্কা করা হয়।

তবে দেহ সবল রাখা পরিমাণ হালাল মাল উপার্জনতো এক অপরিহার্য বিষয়। পক্ষান্তরে কেউ যদি হালাল মাল জমা করা এবং তা বৃদ্ধি করার ইচ্ছা করে তাহলে আমরা তার উদ্দেশ্য যাচাই করবো।

যদি তার উদ্দেশ্য হয় গৌরব-প্রতিযোগিতা ও অহঙ্কার প্রদর্শন তাহলে তা কতইনা নিকৃষ্ট উদ্দেশ্য। আর যদি তার উদ্দেশ্য হয় অন্যের দ্বারস্থ হওয়া থেকে পরিবার-পরিজন ও নিজেকে পবিত্র রাখা, তাদের বিপদাপদে খরচ করা, পারা-প্রতিবেশীর সহযোগিতা করা, গরীব-দুঃখীদের সদকা করা এবং জনকল্যাণকর কাজে খরচ করা তাহলে তার উদ্দেশ্য অনুযায়ী সে সওয়াব লাভ করবে এবং এ উদ্দেশ্যে তার সম্পদ জমা করা বহু নফল এবাদত থেকে উত্তম।

সম্পদ জমা করার ক্ষেত্রে একদল সাহাবীর নিয়্যাত ছিলো ত্রুটিমুক্ত, কেননা এ ক্ষেত্রে তাদের উদ্দেশ্য ছিলো উত্তম, তাই তারা মালের প্রতি আগ্রহী হয়ে মাল বৃদ্ধির প্রার্থনা করেছেন। ইবনে ওমর বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম যোবায়ের (রা.) কে ছারছার নামক একখন্ড জমি দান করেন। তিনি তাকে বললেন, তোমার ঘোড়া দৌড়াও; যেখানে গিয়ে ঘোড়া থামবে সে পর্যন্ত জমির মালিক তুমি। তিনি ঘোড়া দৌড়ানো শুরু করলে এক পর্যায়ে ঘোড়া থেমে যায়, আর তিনি তার চাবুক নিক্ষেপ করেন; তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তার চাবুক যেখানে গিয়ে পড়েছে সে পর্যন্ত যমিও তাকে দিয়ে দাও।

আর সা'দ বিন ওবাদা (রা.) তার দোয়ায় বলতেন, اللهم وسع علي হে আল্লাহ, আপনি আমাকে স্বচ্ছলতা দান করুন।

আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেন, এর চে' মজার বিষয় হলো, ইয়াকুব আলাইহিস সালামকে তার সন্তানেরা যখন বললো, وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ

বানইয়ামিনকে আমাদের সাথে পাঠালে আমরা একউট রসদ বেশি পাবো তখন তিনি রসদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পুত্র বানইয়ামিনকে তাদের সাথে পাঠাতে সম্মত হন।

আইয়ুব আলাইহিস সালাম সুস্থতা লাভ করলে তার দিকে স্বর্ণের ফড়িং নিক্ষেপ করা হলে তিনি বেশি পাওয়ার আশায় সেগুলো কাপড়ে জড়াতে থাকেন। তখন তাকে বলা হলো, তুমি কী তৃপ্ত হওনি? তিনি বললেন, কে এমন আছে যে আপনার অনুগ্রহে তৃপ্ত হয়!

আর সম্পদ লাভের আশা – এটাতো মানুষের স্বভাবজাত বিষয়, আর সম্পদ জমা করার উদ্দেশ্য যদি সৎ হয় তাহলে তা বড়ই কল্যাণকর।

এতো আবু হামেদ গাজ্জালীর বক্তব্যের দলীল ভিত্তিক জবাব, এবার শুনুন হারেছ মুহাসেবীর বক্তব্যের অসারতা।

হারেছ মুহাসেবী যা বলেছেন তা সম্পূর্ণ ভুল, শরঈ বিধি-বিধান সম্পর্কে অজ্ঞতাই তাকে এরূপ বলতে উদ্বুদ্ধ করেছে। কেননা তার বক্তব্য হলো, আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদেরকে সম্পদ জমা করতে নিষেধ করেছেন এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামও তার উম্মতকে মাল জমা করতে বারণ করেছেন। এটাতো এক অসম্ভব বিষয়, বরং জমা করার নিষেধাজ্ঞাতো সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যদি মাল জমা করার উদ্দেশ্য হয় অসৎ কিংবা তা জমা করা হয় অবৈধ পন্থায়। পক্ষান্তরে মাল যদি বৈধ হয় তাহলে সৎ উদ্দেশ্যে তা জমা করার অনুমতি শরীয়তে বিদ্যমান, আর শরীয়ত কোন বিষয়ে অনুমতি দিয়ে তার নিন্দা করবে এটা কিভাবে সম্ভব!

আর হযরত কা'ব ও আবু যরের যে ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ বানোয়াট, যার কোন ভিত্তি নেই। অবশ্য এ ঘটনাটি সূত্র বিহীন অন্য ভাবেও বর্ণিত হয়েছে।

মালেক বিন আবদুল্লাহ যিয়াদী বলেন, হযরত আবু যর (রা.) ওছমানের বাড়িতে এসে প্রবেশের অনুমতি চান। অনুমতি পেয়ে হাতে একটি লাঠি নিয়ে গৃহে প্রবেশ করেন। তখন হযরত কা'বকে সম্বোধন করে ওসমান বলেন, হে কা'ব! আবদুর রহমানতো ইন্তেকাল করেছেন এবং মৃত্যুকালে তিনি অনেক সম্পদ রেখে গেছেন; সুতরাং এ বিষয়ে তোমার অভিমত কি। তখন কা'ব বললেন, যদি তিনি মালের ক্ষেত্রে আল্লাহর হক্ব আদায় করে থাকেন তাহলে কোন সমস্যা নেই। এ কথা শ্রবণে আবু যর লাঠি দ্বারা কা'বকে প্রহার করেন এবং বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি,

ما أحب لو أن لي هذا الجبل ذهبا أنفقه ويتقبل مني أذر خلفي ست أواقي

অর্থঃ যদি আমার জন্য এ পাহড়কে স্বর্ণে রূপান্তর করা হয় এবং তা থেকে আমি আল্লাহর পথে খরচ করি এবং আমার দান কবুল করা হয় তবুও আমি পসন্দ করবোনা যে, আমার মৃত্যুর সময় ছয় উক্বিয়া (বাহাত্তর দেরহাম) রেখে যাবো। অতঃপর আবু যর (রা.) বললেন, হে ওসমান! আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, আপনি কী এ হাদীস শুনেছেন? তিনি এভাবে তিনবার জিজ্ঞেস করলে ওসমান (রা.) বললেন, হাঁ।

আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেন, উপর্যুক্ত হাদীসটি ভিত্তিহীন, আর হাদীসটির রাবী ইবনে লাহিয়াহ অভিযুক্ত, যাকে একাধিক ব্যক্তি দুর্বল আখ্যায়িত করেছেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, ইবনে লাহিয়ার হাদীস দলীল হিসাবে পেশ করার যোগ্য নয়। আর ইতিহাসের বিশুদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী আবু যর (রা.) পঁচিশ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন, আর আবদুর রহমান বিন আউফ বত্রিশ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। অর্থাৎ আবু যরের ইন্তেকালের পরেও আবদুর রহমান বিন আউফ সাত বছর

জীবিত ছিলেন। তাহলে আবদুর রহমান বিন আউফের মৃত্যুর ব্যাপারে আবু যরের জিজ্ঞসার বিষয়টি কিভাবে সহীহ হতে পারে! তদুপরি হাদীসের বর্ণনাধারাও হাদীসটি বানোয়াট হওয়ার উপর দালালত করে।

আর সাহাবায়ে কেরাম কিভাবে বলবেন যে, আমরা আবদুর রহমান বিন আউফের ব্যাপারে আশঙ্কা করছি, অথচ হালাল মাল জমা করা সর্বসম্মতভাবে বৈধ! তাহলে যে বিষয় শরীয়তে বৈধ তার উপর আশঙ্কা কিসের? শরীয়ত কোন বিষয় বৈধ ঘোষণা করে তার উপর শাস্তি প্রয়োগ করবে এটা কী সম্ভব? না না, তা কিছুতেই নয়। বরং শরীয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে অজ্ঞতা ও বুঝ স্বল্পতার কারণেই তারা এরূপ বলে থাকে।

অতঃপর সাহাবাদের নিন্দার বিষয়টি আবদুর রহমান বিন আউফের সাথে সীমাবদ্ধ করার অর্থতো এটাই যে, তিনি সাহাবাদের আদর্শ অনুসরণ করেন নি। অথচ সাহাবী তালহা (রা.) মৃত্যুর সময় তিনশত বোঝা সম্পদ রেখে যান। প্রতি বোঝায় সম্পদের পরিমাণ ছিলো তিন কিনতার, আর প্রতি কিনতার সম্পদের পরিমাণ প্রায় এককোটি দীনার।

হযরত যোবায়েরের (রা.) মালের পরিমাণ ছিলো পঞ্চাশকোটি দুই লক্ষ দিরহাম, আর হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) মৃত্যুর সময় নব্বই হাজার দিরহাম রেখে যান। এভাবে অধিকাংশ সাহাবী সম্পদ উপার্জন করেছেন এবং মৃত্যুর সময় তা ওয়ারিশদের জন্য রেখে গেছেন; কিন্তু এ ব্যাপারে তারা কেউ অন্যের নিন্দা করেন নি।

আর হারেছ মুহাসেবী যে আবদুর রহমান বিন আউফের ব্যাপারে বলেছেন, তিনি কেয়ামতের দিন হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটবেন – তার এ কথাই প্রমাণ করে যে, তিনি হাদীস সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন, অথবা এ

হাদীস তিনি স্বপ্নে দেখেছেন, বাস্তবে শ্রবণ করেন নি।

আবদুর রহমান বিন আউফের (রা.) মতো সাহাবী কেয়ামতের দিন হামাগুড়ি দিয়ে চলবেন! এমন কথা থেকেও আল্লাহর নিকট পানাহ চাই। আচ্ছা বলুনতো, যদি আবদুর রহমান বিন আউফের মতো সাহাবী কেয়ামতের দিন হামাগুড়ি দিয়ে চলেন তাহলে জান্নাতে প্রবেশাধিকারে অগ্রগামী কে হবে! অথচ তিনি ছিলেন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ সাহাবীর অন্যতম, বদরে অংশগ্রহণকারী ঐসব সাহাবীর দলভুক্ত যাদের ব্যাপারে ক্ষমা ঘোষিত হয়েছে, তদুপরি তিনি ছিলেন আহলে শুরার অন্যতম সদশ্য।

এছাড়াও হাদীসটির বর্ণনাকারী আম্মারাহ সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেছেন, তার অধিকাংশ হাদীস মুযতারিব।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বলেন, সে আনাস (রা.) থেকে বহু মুনকার হাদীস বর্ণনা করে।

আবু হাতেম রাযী বলেন, তার হাদীস দলীল হিসাবে পেশ করার যোগ্য নয়।

ইমাম দারে কুতনী বলেন, সে একজন দুর্বল রাবী।

আর হারেছ মুহাসেবীর কথা, হালাল মাল বর্জন করা তা জমা করা থেকে উত্তম – বিষয়টি এমন নয়, বরং উদ্দেশ্য যদি সৎ হয় তাহলে ওলামাদের সর্বসম্মতসিদ্ধান্ত অনুসারে তা জমা করা উত্তম।

আর যে হাদীস সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের সূত্রে বর্ণনা করেছে, من أسف على دنيا فاتته قرب من النار مسيرة سنة অর্থঃ যে ব্যক্তি দুনিয়ার সম্পদ হাতছাড়া হওয়ার পর তার উপর আক্ষেপ করবে সে এক বৎসরের রাস্তা পরিমাণ জাহান্নামের

নিকটবর্তী হবে" অসম্ভব; রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন কথা বলেন নি।

আর সে যে বলেছে, هل تجد في دهرك من الحلال كما وجدت الصحابة অর্থঃ তুমি কী এ যামানায় ঐরকম হালাল সম্পদ পাবে যেমনটি সাহাবায়ে কেরাম (রা.) তাদের যুগে পেয়েছেন! অদ্ভুত কান্ড; কোন জিনিস হালাল সম্পদকে ব্যাধিগ্রস্ত করলো! অথচ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "الحلال بين والحرام بين" অর্থঃ হালাল-হারামের বিধান সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়েছে।

আপনি কী মনে করেন যে, হালাল দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, খনি থেকে স্বর্ণ যে অবস্থায় বের হয়েছে সে অবস্থার উপর বহাল থাকা, তা দ্বারা অবৈধ বেচাকেনা হলে তার বৈধতাগুণ ক্ষুন্ন হবে? এটাতো অসম্ভব বিষয়। বরং শরীয়তের বিধানতো এমন, যদি মুসলমান ইহুদীর নিকট কোন মাল বিক্রি করে তাহলে ফোক্বাহাদের ফতোয়া অনুসারে বিক্রিত মূল্য মুসলমানের জন্য হালাল হবে।

আমি বিস্মিত হই যে, হারেছ মুহাসেবীর কথা শুনেও আবু হামেদ গাজ্জালী কিভাবে নিরব রইলেন, বরং তার সমর্থন করলেন! আর তিনি কিভাবে বললেন যে, মাল হাতছাড়া হওয়া তা লাভ করা থেকে উত্তম, যদিও সে তা কল্যাণকর কাজে ব্যয় করুক। তিনি যদি এর বিপরীত ইজমা দাবী করতেন তাহলে তা সহীহ হতো। কিন্তু তার তাসাওউফ তার ফতোয়াকে পাল্টে দিয়েছে।

মারুযী বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে আবু ওবায়দুল্লার নিকট বলতে শুনেছি, আমারতো ব্যক্তিগত খরচ চালানোর সামর্থ আছে। তিনি বললেন, বাজারে গিয়ে ব্যবসা করো এবং উপার্জিত অর্থ দ্বারা আত্মীয়-স্বজনের সহযোগিতা করো, অসুস্থ ব্যক্তিদের সেবা করো।

আর ইমাম গাজ্জালীর কথা, 'মুরিদের কর্তব্য হলো, সমুদায় ধন-সম্পদ পরিহার করা' আমরা এ কথার উত্তর পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, যদি তার মাল হারাম হয় অথবা তা সন্দেহযুক্ত হয় অথবা তার মাঝে যদি অল্পেতুষ্টির গুণ থাকে কিংবা মাল উপার্জনের কোন পেশা যদি তার থাকে তাহলে তার জন্য সমুদায় সম্পদ পরিহার করা বৈধ; অন্যথায় তা পরিহারের কোন কারণ নেই।

আর সা'লাবার বিষয়টি হলো, মাল তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেনি, বরং মালের যাকাত আদায়ে কৃপণতা প্রদর্শন তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

আর নবীদের ব্যাপারে সে যা উল্লেখ করেছে তার উত্তর হলো, ইবরাহিম আলাইহিস সালাম, শুয়াইব আলাইহিস সালাম ও অন্যান্য নবী-রাসুলের যেমন সম্পদ ছিলো তদ্রুপ ক্ষেত-খামারও ছিলো।

বিখ্যাত তাবেঈ সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (রহ.) বলেন, যে ব্যক্তি মাল অন্বেষণ করেনা তার মাঝে কোন কল্যাণ নেই। কেননা তা দ্বারা সে কর্জ আদায় করবে, নিজের সম্মান রক্ষা করবে এবং আত্মীয়-স্বজনের সেবা করবে। যদি সে মারা যায় তাহলে তা ওয়ারিশদের জন্য মিরাছ হিসাবে রেখে যাবে।

সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব মৃত্যুর সময় চারশত দীনার রেখে যান। আর মৃত্যুর সময় সাহাবাদের রেখে যাওয়া সম্পদের বিবরণতো আমরা ইতিপূর্বে ইল্লেখ করেছি।

সুফিয়ান সাওরীতো মৃত্যুর সময় দুইশত দেরহাম রেখে গেছেন। তিনি বলতেন, এ যামানায় মাল একটি হাতিয়ার। আমাদের পূর্বসূরিরাতো মালের প্রশংসা করতেন এবং বিপদাপদ ও গরীব-দুঃখীদের সহযোগিতার উদ্দেশ্যে তা জমাও করতেন। তবে তাদের একদল এবাদতে মনোনিবেশ ও চিন্তার একাগ্রতা লাভের উদ্দেশ্যে মাল থেকে

দূরে অবস্থান করতেন এবং অল্প রিযিকের উপর তুষ্ট থাকতেন।

যদি এ ব্যক্তি বলতো যে, সম্পদ কম গ্রহণ করা উত্তম, তাহলে তা শুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হতো। কিন্তু সে তা জমা করাকে পাপের স্তরে পৌঁছে দিয়েছে।

এবার শুনুন, দারিদ্রতা একটি ব্যাধি। সুতরাং যে তাতে আক্রান্ত হবে এবং তার উপর সবর করবে সে অবশ্যই সবরের সওয়াব হাসিল করবে। এই কারণেই দরিদ্ররা ধনীদের পাঁচশত বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে; কেননা তারা দুনিয়াতে দুঃখ-কষ্টের উপর সবর করেছে।

আর সম্পদ যেহেতু নেয়ামত, তাই যে তা লাভ করবে তার উপর কর্তব্য হলো, সম্পদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং আল্লাহর নির্দেশিত পথে তা ব্যায় করা। এ কারণেই সম্পদের হিসাব দিতে জান্নাতে প্রবেশে ধনীদের বিলম্ব হবে।

আবু আবদুর রহমান সালামী নামে আরেক সুফী 'সুনানুস সুফিয়্যাহ' নামক গ্রন্থে দরিদ্রলোক মৃত্যুর সময় কোন সম্পদ রেখে যাওয়া মাকরুহ হওয়া প্রসঙ্গে একটি হাদীস উল্লেখ করে তা দ্বারা দলীল পেশ করেন। হাদীসটি এই, عن عبد الله قال توفي رجل من أهل الصفة فوجدوا في شملته دينارين فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيتان অর্থঃ আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) বলেন, আহলে সুফফার একলোকের ইন্তেকাল হলে তার জুব্বার মাঝে দু'টি দীনার পাওয়া যায়। দীনারের বিষয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবহিত করা হলে তিনি বললেন, এতো জাহান্নামের দু'টি দাগ।

উপর্যুক্ত হাদীসের জবাবে আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেন, মৃত্যুর সময় মাল রেখে যাওয়া মাকরুহ হওয়ার বিষয়ে এ হাদীস দ্বারা যে দলীল পেশ করে সেতো হাদীসের পটভূমি বুঝেনি। কেননা আহলে সুফফার এ দরিদ্রলোক সদক্বা গ্রহণ ও সম্পদ জমা করার বিষয়ে দরিদ্রদের সাথে বাদানুবাদে লিপ্ত হতো। তাই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জমাকৃত সম্পদের বিষয়ে বলেছেন, كيتان এতো জাহান্নামের দু'টি দাগ।

আর খোদ সম্পদ রেখে যাওয়া যদি মাকরুহ হতো তাহলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাসকে সম্পদ রেখে যাওয়ার বিষয়ে বলতেন না যে, لأن تترك ورثتك أغنياء خير لك من أن تتركهم عالة يتكففون الناس অর্থঃ তুমি তোমার ওয়ারিশদেরকে স্বচ্ছল অবস্থায় রেখে যাওয়া তাদেরকে দারিদ্রাবস্থায় রেখে যাওয়া থেকে উত্তম, যেন তারা মানুষের দ্বারস্থ না হয়। তদুপরি হযরত সাহাবায়ে কেরামও মৃত্যুর সময় কোন সম্পদ রেখে যেতেন না।

ওমর বিন খাত্তাবের ঘটনাতো এমন, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সদক্বার বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করলে আমি আমার অর্ধেক সম্পদ নিয়ে আসি। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার পরিবারের জন্য কি রেখে এসেছো? আমি বললাম, অনুরুপ সম্পদ রেখে এসেছি। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বিষয়ে আমার নিন্দা করেন নি।

আল্লামা ইবনে জারীর তাবারী বলেন, এই হাদীসটি অজ্ঞ সুফিদের বক্তব্যকে অসার প্রমাণ করে। যেহেতু তাদের বক্তব্য হলো, মানুষের

জন্য বৈধ নয় যে, সে আগামী দিনের জন্য কোন কিছু অবশিষ্ট রাখবে। কেননা যে এমনটি করবে সেতো স্বীয় প্রতিপালকের ব্যাপারে বদ ধারণা করলো এবং তার জিম্মাদারীর প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করে তাওয়াক্কুল পরিপন্থী কাজে লিপ্ত হলো।

ইবনে জারীর (রহ.) আরো বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "اتخذوا الغنم فإنها بركة" অর্থঃ তোমরা বকরী প্রতিপালন করো, কেননা তা বরকতময় প্রাণী" রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ কথা ঐসকল সুফিদের বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করে, যারা বলে যে, আল্লাহর উপর বান্দার তাওয়াক্কুল তখনই সহীহ হবে যখন তার সকাল যাপন এমতাবস্থায় হবে যে, তার কাঁছে না থাকবে সম্পদ না থাকবে খাবার; অনুরুপভাবে তার বিকাল যাপনও এভাবে হবে।

হায় আফসোস; এসব সুফিরা যদি জানতো যে, স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ স্ত্রীদের জন্য এক বছরের খাবার মজুদ রেখেছেন!

তাদের এক সম্প্রদায়ের অবস্থাতো এমন, তারা মালিকানাধীন সমুদায় সম্পত্তি সদকা করে মানুষের দ্বারস্থ হয়। আর তা একারণেই যে, মানুষের প্রয়োজন কখনো ফুরায় না। পক্ষান্তরে যে বুদ্ধিমান, সে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করে।

জাবের বিন আবদুল্লাহ বলেন, قدم أبو حصين السلمي بذهب من معدنهم فقضى دينا كان عليه وفضل معه مثل بيضة الحمامة فأتى بها رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال يا رسول الله ضع هذه حيث أراك الله

أو حيث رأيت قال فجاءه عن يمينه فأعرض عنه ثم جاءه عن يساره فأعرض عنه ثم جاءه من بين يديه فنكس رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأسه فلما أكثر عليه أخذها من يديه فحذفه بها لو أصابته لعقرته ثم أقبل عليه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "يعمد أحدكم إلى ماله فيتصدق به ثم يقعد فيتكفف الناس وإنما الصدقة عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول, অর্থঃ আবু হুসাইন তাদের খনি থেকে এক খন্ড স্বর্ণ নিয়ে আগমন করেন। অতঃপর তা দ্বারা কর্জ পরিশোধের পর কবুতরের ডিম পরিমাণ কিছু স্বর্ণ উদ্বৃত্ত হলে তিনি তা নিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন হে আল্লাহর রাসুল, আপনি যা ভালো মনে করেন সে অনুযায়ী এ স্বর্ণ খরচ করুন। তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের ডান পাশে আসলে রাসুল মুখ ফিরিয়ে নেন, অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাম পাশে আসলে রাসুল মুখ ফিরিয়ে নেন, অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে আসলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মাথা মোবারক নিচু করেন। স্বর্ণ গ্রহণের ব্যাপারে তার পীড়াপীড়ির মাত্রা যখন বেড়ে যায় তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার হাত থেকে নিয়ে তা এমনভাবে নিক্ষেপ করেন, যদি তার গায়ে তার আঘাত লাগতো তাহলে সে মৃত্যুবরণ করতো। অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দিকে মনোনিবেশ করে বললেন, তোমাদের কারো অবস্থাতো এমন, যে তার সম্পদের পুরোটা সদক্বা

করার পর নিঃস্ব হয়ে মানুষের নিকট হাত পাতে। আরে আহমক! সদক্বাতো স্বচ্ছলতার সাথে করতে হয়, আর সদক্বার সর্বাধিক হক্বদার তোমার পরিবার। সুতরাং তাদেরকে দিয়ে শুরু করো।

আবু দাউদের এক রেওয়ায়েতে আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, دخل رجل المسجد فأمر رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يطرحوا ثيابا فطرحوا فأمر له منها بثوبين ثم حث على الصدقة فجاء فطرح أحد الثوبين فصاح به: "خذ ثوبك" অর্থঃ এক দরিদ্রলোক মসজিদে প্রবেশ করলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদেরকে কাপড় দানের নির্দেশ দিলে তারা কাপড় নিক্ষেপ করেন। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকটিকে সেখান থেকে দু'টি কাপড় নেয়ার নির্দেশ দেন। অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুনরায় সদক্বার ব্যাপারে উৎসাহ দিলে লোকটি কাপড়দ্বয়ের একটি নিক্ষেপ করে। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম আওয়াজ দিয়ে বললেন, তোমার কাপড় নিয়ে যাও।

সুফিদের কতক এমনও আছেন, তাদের হাতে কোন মাল থাকলে তারা তা খরচ করে বলেন, আমি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উপর নির্ভর করতে চাইনা। শরীয়ত সম্পর্কে জ্ঞান স্বল্পতার কারণেই তারা এরূপ বলেন। কেননা তাদের ধারণা হলো, তাওয়াক্কুলের অর্থই হচ্ছে অসবাব মুক্ত হওয়া এবং মাল শূন্য হওয়া।

হাফেজ আবু নুআঈম বলেন, জা'ফর খুলদী তার কিতাবে লিখেন, আমি জুনাইদ বাগদাদীকে বলতে শুনেছি, আমরা একবার দলবদ্ধ হয়ে আবু ইয়াকুব যায়্যাতের বাড়িতে গিয়ে দরজায় কড়া নাড়লে তিনি

বললেন, আল্লাহর এবাদতে তোমাদের কী এমন কোন ব্যস্ততা নেই যা তোমাদেরকে আমার নিকট আসতে বাঁধা দেয়। তখন আমি বললাম, আপনার নিকট আমাদের আগমনতো আল্লাহর এবাদতে ব্যস্ততারই অংশ। তখন আমরা তাকে তাওয়াক্কুল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি সাথে থাকা একটি দিরহাম দান করে আমাদেরকে তাওয়াক্কুলের সঠিক বর্ণনা দিয়ে বললেন, আমার কাছে সম্পদ বিদ্যমান থাকাবস্থায় তোমাকে তাওয়াক্কুলের ব্যাখ্যা দিতে আমি লজ্জাবোধ করেছি।

আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেন, এসব সুফিরা যদি তাওয়াক্কুলের অর্থ বুঝতো, 'আল্লাহর প্রতি অন্তরের আস্থার নাম তাওয়াক্কুল, বাহ্যিক সম্পদ মুক্ত হওয়ার নাম নয়' তাহলে তারা এসব কথা বলতো না। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, তারা তাওয়াক্কুলের অর্থ বুঝতে অক্ষম হয়েছে। তাদের জেনে রাখা উচিত যে, নেতৃস্থানীয় সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈগণ ব্যাবসা করেছেন ও সম্পদ জমা করেছেন। তাদের কারো থেকে এমন বক্তব্য প্রকাশ পায়নি।

আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনাতো এমন, খেলাফতের দায়িত্ব তার ঘাড়ে অর্পিত হলে রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যস্ততার দরুন তিনি বললেন, আমার পরিবারের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা কোথা হইতে হবে? অথচ এমন কথা যদি কেউ বলে তাহলে এসব সুফিরা তার নিন্দা করেন এবং তার বক্তব্যকে তাওয়াক্কুল পরিপন্থী বলেন।

আচ্ছা বলুনতো, যদি সাহাবাদের কথা-কাজ তাওয়াক্কুল পরিপন্থী হয় তাহলে এমন কে আছে যার কথা-কাজ তাওয়াক্কুল সমর্থিত হবে! অথচ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم অর্থঃ আমার সাহাবারা

নক্ষত্র তুল্য, তাদের যে কাউকে তোমরা অনুসরণ করবে হেদায়েতের সঠিক পথ পেয়ে যাবে।

অনুরুপভাবে তারা ঐ ব্যক্তির নিন্দা করেন, যে বলে যে, এই খাবার আমার জন্য ক্ষতিকর। তাদের বক্তব্যের সমর্থনে তারা আবু তালেব রাজির ঘটনা বর্ণনা করেন। আবু তালেব রাজি বলেন, আমি আমার সাথী-সঙ্গীদের সাথে এক স্থানে উপস্থিত হলে সেখানকার লোকেরা আমাদের জন্য দুধ উপস্থিত করে। তারা আমাকে দুধপানের আহ্বান জানালে আমি বললাম, আমি তা পান করবোনা, কেননা তা আমার জন্য ক্ষতিকর। এ ঘটনার চল্লিশদিন পর আমি একদিন মাকামে ইবরাহিমের পিছে নামাজ আদায়ের পর আল্লাহর নিকট মুনাজাতে বললাম, হে আল্লাহ! আপনি জানেন যে, আমি এক পলকও আপনার সাথে কাউকে শরীক করি নাই। তখন গায়েব থেকে কেউ আওয়াজ দিয়ে বললো, দুধের ঘটনা কী ভুলে গেছো?

আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেন, এ ঘটনার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন। তবে এ বিষয়টি ভালোভাবে জেনে রাখুন, যে ব্যক্তি বলে যে 'এ বস্তু আমার জন্য ক্ষতিকর' তার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, ক্ষতি পৌছানোর ক্ষেত্রে এ বস্তু স্বয়ংসম্পন্ন, বরং তার উদ্দেশ্য হলো, ক্ষতি পৌছানোর ক্ষেত্রে এ বস্তু একটি মাধ্যম। যেভাবে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বলেছেন, رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ অর্থঃ প্রভু হে, এসব মূর্তিগুলো বহু মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে; অর্থাৎ তারা বহু মানুষের পথভ্রষ্ট হওয়ার মাধ্যম।

বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত এক হাদীসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "ما نفعني مال كمال أبي بكر" অর্থঃ

আবু বকরের মাল আমার যে উপকার করেছে অন্য কারো মাল তা করে নি।

অন্য বর্ণনায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ما زالت أكلة خيبر تعاودني كل عام حتى كأن هذا أوان انقطاع أبهري অর্থঃ খায়বারের দিন বিষাক্ত খাবারের যে লোকমা আমি খেয়েছিলাম তার যন্ত্রণা প্রতিবছর আমাকে দগ্ধ করে। যখন সে যন্ত্রণা শুরু হয় তখন মনে হয় যে আমার মেরুদন্ডের শিরা ছিরে যাবে।

এ বিষয়টিতো সুসাব্যস্ত ও সর্বজন বিদিত যে, নবুওয়াতের স্তর সর্বোচ্চ মর্যাদাপূর্ণ স্তর, তার উপর কোন স্তর নেই। অথচ সকল নবীদের সর্দার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপকারকে মালের দিকে এবং ক্ষতিকে খাবারের দিকে সম্পৃক্ত করেছেন। সুতরাং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাল-চলন ও আচার-উচ্চারণকে এড়িয়ে শরীয়ত বিরোধী অনর্থক কথা-বার্তা ও কাজ-কর্মের অনুশীলন যে করবে তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা হবে না।

আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, প্রথম যুগের সুফিরা দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তির কারণেই সম্পদ জমা করা থেকে বিরত ছিলেন এবং এ ক্ষেত্রে তাদের উদ্দেশ্য সৎ ছিলো। তবে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে তারা ছিলেন ভুল পথে পরিচালিত – তাদের শরীয়ত ও আক্বল বিরোধী কাজ-কর্ম থেকে আমরা যেমনটি বুঝতে পেরেছি।

পক্ষান্তরে পরবর্তী যুগের সুফিদের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়েছে এবং হালাল-হারামের বাছ-বিচার ছাড়াই সম্পদ জমা করা শুরু করেছে; যেন দুনিয়াতে আয়েশী জীবনযাপন ও প্রবৃত্তির অনুসরণই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

তাদের কারো অবস্থা এমন তারা উপার্জনে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও কাজ-কর্মে লিপ্ত হয়না। তারা মসজিদ অথবা উপাসনালয়ে বসে মানুষের সদক্বার উপর নির্ভর করে, আর তাদের অন্তর নিবিষ্ট থাকে দরজায় কড়ানাড়ার প্রতি। অথচ এ বিষয়টি সর্বজন বিদিত যে, ধনী ও উপার্জনে সক্ষম ব্যক্তির জন্য সদক্বা বৈধ নয়।

তারা এ বিষয়ে পরোয়া করেনা যে, মাল তাদের নিকট কে পাঠালো। যদি জালেম অথবা শুল্ক আদায়কারী তাদের নিকট মাল পাঠায় তারা তা ফিরিয়ে দেন না। তারা ব্যাখ্যা স্বরূপ বলেন, আমাদের রিজিকতো আমাদের নিকট পৌছবেই; অথবা বলেন, এ মালতো আল্লাহর পক্ষ হতেই এসেছে, সুতরাং তা ফিরিয়ে দেয়া উচিত নয়। অথচ তারা যা করছে এর সবগুলোই শরীয়ত বিরোধী, শরীয়ত সম্পর্কে অজ্ঞতা ও আমাদের পূর্বসূরি নেককারদের মত ও পথের সাথে সাংঘর্ষিক। কেননা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه" অর্থঃ হালাল-হারামের বিষয় সুস্পষ্ট, আর এতদুভয়ের মাঝে বহু সন্দেহযুক্ত বিষয় বিদ্যমান, অধিকাংশ মানুষ যে বিষয়ে অনবগত। সুতরাং আল্লাহর ভয়ে এসব সন্দেযুক্ত বিষয় যে পরিহার করবে সে তার দীন ও সম্মান রক্ষায় প্রাণান্তিক চেষ্টা করলো।

আমাদের পূর্বসূরি মহাপুরুষরাতো কোন জালেমের দান গ্রহণ করতেন না এবং ঐ ব্যক্তির দানও গ্রহণ করতেন না যার মাল সন্দেহযুক্ত। তাদের অধিকাংশের বৈশিষ্ট ছিলো, তারা পবিত্রতা রক্ষা ও হারাম ভক্ষণের ভয়ে সাথী-সঙ্গী ও বন্ধু-বান্ধবের উপঢৌকন গ্রহণ করতেন না।

আবু বকর মারুযী বলেন, আমি আবু আবদুল্লাহর নিকট এক মুহাদ্দিসের আলোচনা তুললে তিনি বললেন, 'আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন' যদি তার মাঝে একটি স্বভাব না থাকতো তাহলে যোগ্যতা ও গুণাবলিতে তার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

অতঃপর কিছুক্ষণ নিরব থাকার পর আমি তাকে বললাম, তিনি কী সুন্নাতের অনুসারী ছিলেন না? তিনি বললেন, আল্লাহর কসম; আমি তার থেকে হাদীসও লিখেছি, কিন্তু তার একটি বদস্বভাব হলো, তিনি এ বিষয়ে পরোয়া করতেন না যে, মাল কার থেকে গ্রহণ করেছেন।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, আমাদের নিকট এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, এক সুফি কোন এক আমীরের দরবারে প্রবেশ করে আমীরকে ওয়াজ শুনালে আমীর তাকে দান স্বরুপ কিছু সম্পদ দেয় এবং সেও তা আনন্দচিত্তে গ্রহণ করে। তখন আমীর বললেন, আমরা সবাই শিকারী, তবে শিকারের ফাঁদ বিভিন্ন রকম।

আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেন, প্রথম যুগের সুফিরা মাল অর্জনের বিষয়ে চিন্তা করতেন এবং তাদের খাবারের বিষয়ে খোঁজ নিতেন। ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে বিখ্যাত সুফি সারী সাকাতী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, তিনি হালাল খাদ্য গ্রহণের বিষয়ে এক প্রসিদ্ধ শায়খ।

সারী সাক্বাতী বলেন, জিহাদের উদ্দেশ্যে আমি এক দলের সাথে শরীক হলাম। তখন আমরা এক ঘর ভাড়া নিয়ে তাতে আমি এক চুলা তৈয়ার করলে আমার সাথী-সঙ্গীরা সেই চুলার রুটি খেতে ইতস্ত ত বোধ করে।

আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেন, আমি এক সুফির নিকট তার শায়খের সন্ধান চাইলে সে আমাকে বললো, শায়খতো অমুক আমিরের দরবারে

গিয়েছেন। আমির আজ শায়খকে এক সম্মানসূচক পোষাক দ্বারা অভিবাদন জানাবেন, অবশ্য আমিও আমির থেকে এরুপ পোষাক লাভ করেছি। অথচ সেই আমীর ছিলো এক বিখ্যাত জালেম। তখন আমি বললাম, তোমাদের জন্য আফসোস হয়; তোমরা কেন ব্যবসার উদ্দেশ্যে দোকান খুলছোনা এবং মাথায় পণ্য বহন করে মাল উপার্জন করছোনা! আর কেনইবা উপার্জনে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও তা থেকে বিরত থেকে মানুষের সদক্বা ও উপঢৌকনের উপর নির্ভর করছো! তদুপরি তোমরা পরোয়া করছোনা যে, মাল কোথা হইতে আসছে এবং কে তা পাঠাচ্ছে। তার উপার্জন কী হালাল, কিংবা হালাল হলেও তা কী সন্দেহযুক্ত না সন্দেহমুক্ত। তোমরা দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে রাজা-বাদশাহদের দুয়ারে ঘুরছো এবং তাদের অনুদান লাভের আশায় তাদের স্বরণাপন্ন হচ্ছো। তারা তোমাদেরকে অভিবাদন জানাচ্ছে এমন পোষাক দ্বারা যা বৈধ নয়, এমন রাজত্ব দ্বারা যা ন্যায়সম্মত নয়। আল্লাহর কসম; তোমরা ইসলামের জন্য সবচে' বেশি ক্ষতিকর।

আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেন, কতক সুফি শায়খের অবস্থা এমন, মালের আধিক্য এবং তা জমা করার লিপ্সা দীলে বদ্ধমূল থাকা সত্ত্বেও সে দুনিয়া বিমুখতার দাবি করে। আবার কারো অবস্থা এমন, সে মাল জমা করা সত্ত্বেও অভাব প্রকাশ করে। এদের অধিকাংশের অবস্থা এমন, তারা যাকাত গ্রহণের ব্যাপারে দরিদ্রদেরকে বাঁধা দেয় এবং তাদের সাথে বাদানুবাদে লিপ্ত হয়, কিন্তু নিজে তা জমা করে।

আবুল হাসান বুসতামী নামে জনৈক সুফি-সম্রাট শীত-গ্রীষ্ম উভয়কালে পশমীপোষাক পরিধান করতেন। তার উদ্দেশ্য ছিলো মানুষ যেন তার জুব্বা দ্বারা বরকত হাসিল করে; অথচ এই সুফি মৃত্যুর সময় চার হাজার দীনার রেখে যান।

আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেন, এতো সর্বাধিক নিন্দিত বিষয়। কেননা সে অন্যকে সম্পদ জমা করা থেকে বারণ করতো, আর নিজে তা জমা করতো। অথচ আহলে সুফ্ফার এক দরিদ্র লোক মৃত্যুর সময় দুই দীনার রেখে গেলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এতো জাহান্নামের দু'টি দাগ। আর লোকটির ব্যাপারে রাসুল এ মন্তব্য এজন্যেই করেছিলেন, যেহেতু সে জীবদ্দশায় অন্যকে মাল জমা করতে নিষেধ করতো অথচ নিজেই তা জমা করতো।

সুফিদের পানাহারের ক্ষেত্রে শয়তানের ধোঁকাদানের বিবরণ

আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেন, শয়তান প্রথম যুগের সুফিদের উপর নেক চক্রান্তের মজবুত মিশন পরিচালনা করেছে। সে তাদেরকে অল্পাহার ও বিস্বাদ-শুষ্ক খবারে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং সুপেয় ঠান্ডাপানি থেকে নিবৃত্ত করেছে। তবে পরবর্তীদের ক্ষেত্রে সে তার ধোঁকার কৌশল পরিবর্তন করেছে। কষ্ট-মোজাহাদায় সে তাদের মাঝে অনিহাভাব সৃষ্টি করেছে এবং অধিক ভোজন ও আয়েশী জীবনে সে তাদেরকে মুগ্ধ করেছে।

প্রথমযুগের সুফিদের কিছু কর্ম ও তার দলীলভিত্তিক জবাব

আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেন, তাদের কতকের অবস্থা এমন, তারা দীর্ঘদিন পানাহার থেকে বিরত থাকেন। যখন শক্তি নিস্তেজ হয়ে যায় তখন খাদ্য গ্রহণ করেন।

আবার কতকের অবস্থা এমন, যারা দিনে এত অল্প আহার করেন যা দেহের সবলতার জন্য যথেষ্ট নয়।

বিখ্যাত সুফি সাহল বিন আবদুল্লাহর ঘটনা এমন, তিনি সাধনার প্রথম দিকে এক দিরহাম দ্বারা গুড়, দুই দিরহাম দ্বারা ঘি ও এক দিরহাম দ্বারা চালের গুড়া ক্রয় করতেন। অতঃপর তা একত্রে মিশিয়ে তিনশত ষাটটি লাড্ডু বানাতেন এবং প্রতিরাতে একটি করে লাড্ডু দ্বারা ইফতার করতেন।

তার ব্যাপারে আবু হামেদ তুসি আরো বলেন, সাহল বিন আবদুল্লাহ কিছুদিন কুল গাছের পাতা খেয়ে জীবিকা নির্বাহ করেছেন, আর খড়কুটার গুড়া খেয়ে জীবিকা নির্বাহ করেছেন তিন বছর। এছাড়াও তিনি দীর্ঘ তিন বছর তিন দিরহাম দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেছেন।

আবু জা'ফর হাদ্দাদ বলেন, আবু তুরাব একদিন আমার নিকট আগমন করে। তখন আমি এক পানি বেষ্টিত স্থানে বসা ছিলাম। প্রায় ষোলদিন হলো, আমি কোন পানাহার করিনি। সে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি এখানে বসে কী করছো? আমি বললাম, আমি ইলম ও একিনের শ্রেষ্ঠত নিয়ে চিন্তা করছি।

যার শ্রেষ্ঠত্ব আমার দীলে প্রাধান্য পাবে আমি তার অনুসরণ করবো। সে আমাকে বললো, তুমি অচিরেই উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হবে।

ইবরাহিম বিন বান্না আল বাগদাদী বলেন, আমি এক সফরে ইখমিম থেকে ইসকানদার পর্যন্ত যুন্নুন মিসরীর সাথে ছিলাম। যখন ইফতারের সময় হলো তখন আমার সাথে থাকা লবন ও রুটি বের করে তাকে আহারের আহ্বান জানালে তিনি আমাকে বললেন, তোমার লবন কী চূর্ণিত? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, তুমি সফল হতে পারবেনা। আমি দেখলাম যে, তার পাথেয় রাখার পাত্রে কিছু যবের ছাতু আছে এবং তিনি তা গিলে খাচ্ছেন।

আহমদ বিন আনাছ আল হাওয়ারী বলেন, মধু দ্বারা মাখন খাওয়া এক প্রকার অপচয়।

মুহাম্মদ বিন ইউছুফ বসরী বলেন, আমি সাহল বিন আবদুল্লাহর সাথী আবু সাঈদকে বলতে শুনেছি যে, আবু আবদুল্লাহ যোবায়রী, যাকারিয়া সাজি ও ইবনে আবী আওফার নিকট এ সংবাদ পৌছলো যে, সাহল বিন আবদুল্লাহ বলেন, আমি মাখলুকের উপর আল্লাহর দলীল। তখন তারা সকলে তার নিকট সমবেত হলে যোবায়রী তাকে বললো, আমরা শুনতে পেলাম যে আপনি দাবি করেন, আপনি মাখলুকের উপর আল্লাহর দলীল? আপনি কিসের ভিত্তিতে এ দাবি করেন? আপনি কী নবী, না আপনি সিদ্দিক? তখন সাহল বিন আবদুল্লাহ বললেন, তুমি যা ধারণা করছো আমি সে স্তরে পৌছিনি। কিন্তু আমার এ কথা বলার একমাত্র কারণ, আমি হালালখাদ্য গ্রহণ করি। সুতরাং তোমরা সকলে আসো আমরা হালালকে সংশোধন করি। সে বললো, আপনি কী তা সংশোধন করেছেন? তিনি বললেন, হাঁ। সে বললো, আপনি কিভাবে তা সংশোধন করলেন? তিনি বললেন, আমি আমার আক্বল, মারেফত ও শক্তিকে সাতভাগ করেছি। যখন এ সাতভাগের ছয়ভাগ নিস্তেজ হয়ে একভাগ বাকি থাকে এবং সে একভাগও নিস্তেজ হয়ে আমার জীবন নাশের আশঙ্কা হয় তখন এ পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করি যা দ্বারা আমার নিস্তেজ হওয়া ছয়ভাগ কোনরকম সবল হয়।

আবু আবদুল্লাহ বিন মুফলিহ তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, আমাকে আবু আবদুল্লাহ বিন যায়দ বলেছেন, আমি আজ চল্লিশ বছর যাবত এমন অবস্থায় উপনিত হওয়ার আগে খাদ্য গ্রহণ করি না, যে অবস্থায় উপনিত হলে শরীয়ত মৃত প্রাণি খাওয়ার অনুমতি দেয়।

ঈসা বিন আদম বলেন, এক ব্যক্তি আবু ইয়াজিদের নিকট এসে বললো, আপনি যে মসজিদে অবস্থান করেন আমি সেখানে অবস্থান করতে চাই। তিনি বললেন, তুমি তা পারবেনা। সে বললো, আপনি

একবার সুযোগ দিয়ে দেখুন। আবু ইয়াজিদ তাকে অনুমতি দিলে সে একদিন পানাহার বিহিন ধৈর্যসহকারে অবস্থান করে। দ্বিতীয় দিন সে ধৈর্যহারা হয়ে আবু ইয়াযিদকে বললো, ওস্তাদ জী! খাবার ছাড়াতো আর পারছিনা। আবু ইয়াজিদ বললেন, হে বৎস! খাদ্যতো আল্লাহর পক্ষ হতেই আসবে। সে বললো, ওস্তাদ জী! কোমর সোজা হয় পরিমাণ খাদ্যের আবেদন করছি। আবু ইয়াজিদ বললেন, হে বৎস! আল্লাহর আনুগত্যই আমাদের খাদ্য। সে বললো, ওস্তাদ জী! আমি এমন কিছু চাচ্ছি আল্লাহর আনুগত্যে যা আমার দেহকে সবল করবে। তিনি বললেন, হে বৎস! আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া দেহ সবল হতে পারেনা।

আবুল কাসেম কায়রাওয়ানী বলেন, আমার এক সাথীকে বলতে শুনেছি, আবুল হাসান নাসিবী হারাম শরীফে কিছু সাথী-সঙ্গীর সাথে অবস্থান করেন। তারা সাতদিন অনাহারে থাকার পর এক সাথী পবিত্রতা হাসিলের উদ্দেশ্যে বের হয়ে সামনে এক তরমুজের খোসা দেখতে পান। তিনি খোসাটি উঠিয়ে ভক্ষণ করলে এক লোক তা দেখে ফেলে। তখন লোকটি আরোকিছু তরমুজের খোসা তার সামনে উপস্থিত করলে সে তা নিয়ে সাথীদের সামনে বিনয়ের সাথে উপস্থিত করে। খোসা দেখে শায়খ আবুল হাসান নাসিবী বললেন, তোমাদের কে এই অপরাধ করেছে? সে তখন বললো, আমি। তখন শায়খ বললেন, তুমি তোমার অপরাধের সাথেই থাকো। শায়খ আবুল হাসান নাসিবী তার সাথীদের নিয়ে হারাম শরীফ থেকে বের হলে সে লোকটিও তাদের অনুসরণ করে। তখন শায়খ নাসিবী বলেন, আমি কী তোমায় বলিনি যে, তুমি তোমার অপরাধের সাথেই থাকো। লোকটি বললো, আমার অপরাধ থেকে আমি আল্লাহর নিকট তাওবা

করেছি। তখন শায়খ বললেন, তাওবার পরেতো আর কিছু বলা যায়না।

বুনান বিন মুহাম্মদ বলেন, আমি কিছুদিন মক্কার পাশে অবস্থান করেছি। সেখানে আমার পানাহার বিহিন কিছুদিন অতিবাহিত হলে আমি শুনলাম যে, মক্কায় মুযাইন নামক জনৈক ব্যক্তি দরিদ্রদেরকে ভালোবাসেন। তার উত্তম গুণাবলির একটি এটাও যে, কোন দরিদ্রলোক তার নিকট এসে শিঙা লাগালে তিনি গোস্ত ক্রয় করে পাকাতেন, অতঃপর তা দরিদ্রকে খাওয়াতেন। তখন আমি তার নিকট গিয়ে বললাম, আমি শিঙা লাগাতে চাই। তখন তিনি এক লোককে গোস্ত ক্রয়ের উদ্দেশ্যে বাজারে পাঠান এবং তা ভালোভাবে পাকানোর নির্দেশ দেন।

আমি শিঙা লাগানোর উদ্দেশ্যে তার সামনে বসলে আমার নফস বললো, কী আনন্দ; শিঙা লাগানো শেষ হলেই গোস্ত খেতে পারবো। কিছুক্ষণ পরেই আমার চেতনা ফিরে আসে। আমি বললাম, হে নফস! খাদ্য গ্রহণের উদ্দেশ্যে তুমি শিঙা লাগাতে এসেছো? আল্লাহর কসম; আমি তার খাবারের স্বাদও চাখবোনা। শিঙা লাগানো শেষ হলে আমি খাদ্যগ্রহণ ব্যতীতই মসজিদে হারামে চলে আসি। অতএব এই দিনও আমার ভাগ্যে কোন খাবার জোটেনি।

পরদিন বিকাল পর্যন্ত আমি যখন অনাহারে কাটিয়ে আসরের নামাজে দাঁড়াই তখন অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাই। লোকেরা আমার চারপাশে জড়ো হয়ে আমাকে পাগল ধারণা করলে ইবরাহিম দাঁড়িয়ে লোকদেরকে সরিয়ে দেয়। সে আমার নিকটে বসে জিজ্ঞেস করলো, কিছু খাবে? আমি বললাম, রাত ঘনিয়ে এসেছে। সে তখন বললো, হে সাধনার জগতে নব আগমনকারী, তুমি বড় ভালো কাজ করেছো।

সুতরাং তুমি এর উপর অটল থাকো, তাহলে সফলতা লাভ করবে। অতঃপর তিনি চলে যান।

এশার নামাজের পর তিনি একটি থালায় দু'টি রুটি, কিছু ডাল ও পানি উপস্থিত করে বললেন, তুমি তা ভক্ষণ করো। আমি ডাল ও রুটি দু'টি ভক্ষণ করলে তিনি বললেন, তোমার মাঝে শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে, তুমি কী আর কিছু খাবে? আমি বললাম, হাঁ। তিনি গৃহে প্রবেশ করে একটি পাত্রে ডাল ও দু'টি রুটি নিয়ে আসলে আমি তা ভক্ষণ করে বললাম, আমি তৃপ্ত হয়েছি। তখন আমি শুয়ে ভোর পর্যন্ত ঘুমিয়েছি, কিন্তু রাতে উঠে নামাজ ও তাওয়াফের সৌভাগ্য হয়নি।

মানসুর বিন আবদুল্লাহ বলেন, আমি আবু আলী রুজবারীকে বলতে শুনেছি, কোন সুফি যদি পাঁচদিন উপবাসের পর বলে যে, আমি ক্ষুধার্ত, তাহলে তাকে জোরপূর্বক বাজারে পাঠিয়ে রুজি উপার্জনের নির্দেশ দাও।

ইবনে বাকুইয়াহ বলেন, আমি আবু আহমদ সগীরকে বলতে শুনেছি, আবু আবদুল্লাহ খফীফ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন প্রতিরাতে তার সামনে দশটি কিশমিশ উপস্থিত করি, যা দ্বারা তিনি ইফতার করবেন। আমি তার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে এক রাতে তার জন্য পনেরটি কিশমিশ উপস্থিত করি। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমাকে এ নির্দেশ কে দিয়েছে? তিনি তা হতে কিশমিশের দশটি দানা খেয়ে বাকিগুলো রেখে দেন।

আবদুল্লাহ বিন খফীফ বলেন, তাসাওউফের শুরুতে দীর্ঘ চল্লিশমাস আমার নিয়ম ছিলো, আমি প্রতিরাতে একমুঠ শিম দিয়ে ইফতার করতাম। একদিন আমি সিঙ্গা লাগানোর উদ্দেশ্যে এক রক্ত মোক্ষকের নিকট যাই। তিনি সিঙ্গায় টান দিলে আমার লোমকূপ দিয়ে গোস্তের পানিসদৃশ এক পদার্থ বেরুনো শুরু হলে আমি অচেতন হয়ে পরে

যাই। তখন রক্তমোক্ষক এ দৃশ্য অবলোকনে বললো, কোন মানুষের দেহে আমি এরূপ পদার্থ দেখিনি!

আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেন, এসব সুফিদের এক সম্প্রদায় এমনও ছিলেন যারা কখনো গোস্ত খেতেন না।

তাদের কেউতো এমনও বলতেন, এক দিরহাম পরিমাণ গোস্ত যে ভক্ষণ করবে তার অন্তর চল্লিশদিন পর্যন্ত কঠিন থাকবে। আবার কারো অবস্থা এমনও ছিলো, যারা উৎকৃষ্টমানের খাদ্য গ্রহণে নিজেদেরকে বিরত রাখতো। দলীল স্বরূপ তারা আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস পেশ করে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, أحرموا أنفسكم طيب الطعام فانما قوي الشيطان أن يجري في العروق بها অর্থঃ তোমরা উৎকৃষ্টমানের খাদ্য গ্রহণে নিজেদেরকে বঞ্চিত রাখো; কেননা এ ধরনের খাদ্যগ্রহণে শয়তান মানুষের শিরা-উপশিরায় বিচরণের শক্তি অর্জন করে।

তাদের কারো অবস্থা এমন, যে ঠান্ডা পানি কখনোই পান করতোনা, বরং সর্বদা গরম পানি পান করতো।

কারো অবস্থা এমন, যে কখনো স্বচ্ছ পানি পান করতোনা। আবার কারো অবস্থা এমন, যে দীর্ঘ সময় পানি পান হতে বিরত থেকে নিজেকে কষ্ট দিত।

ঈসা বিন মুসা বুসতামী তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, আমি আমার চাচা আবু ইয়াযিদের খাদেমকে বলতে শুনেছি, মানুষ সাধারণত যা খায় আমি চল্লিশ বছর যাবত তা ভক্ষণ করি নি। আমি একবার আমার নফসকে আমার জন্য কল্যাণকর বিষয় পালনের

আহ্বান জানালে নফস তা প্রত্যাখান করে, তাই আমি একবছরকাল পানি পান না করার প্রতিজ্ঞা করে এক বছর পর্যন্ত পানি পান থেকে বিরত থাকি।

আবু হামেদ গাজ্জালী বলেন, আবু ইয়াজিদকে বলতে শুনেছি, আমি আমার নফসকে আল্লাহর নির্দেশ পালনের আহ্বান জানালে নফস তা প্রত্যাখ্যান করে, তাই আমি নফসের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে এক বছর পানি পান না করার ও এক বছর বিশ্রাম না করার প্রতিজ্ঞা করলে আমার প্রতিজ্ঞা বাস্তবায়িত হয়।

আল্লামা ইবনুল জাওযী বলে, আবু তালেব মক্কী সুফিদের জন্য খাবারের নিয়ম বিন্যাস করে বলেন, মুরিদের জন্য মুস্তাহাব হলো, দিন-রাতে দুই রুটির বেশি না খাওয়া।

এসব সুফিদের কতকের অবস্থা হলো, তারা খাবার মেপে খান, ফলে প্রতিদিন খাবারের পরিমাণ অল্প অল্প কমাতে থাকেন। আবার কতকের অবস্থা এমন, তারা প্রথমে দিনে একবার খাদ্য গ্রহণ করেন, অতঃপর কিছুদিন অতিবাহিত হলে দু' দিন পর একবার খাদ্যগ্রহণ করেন, এভাবে ক্রমান্বয়ে তাদের খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ কমে আসে।

তাদের বক্তব্য হলো, ক্ষুধা অন্তরের রক্ত হ্রাস করে অন্তরকে শুভ্র করে, আর অন্তরের শুভ্রতার মাঝে নূর বিরাজ করে। এছাড়াও ক্ষুধা অন্তরের চর্বি বিগলিত করে, আর তা বিগলিত হলে অন্তর নরম হয়, আর অন্তরের নম্রতা আল্লাহর মারেফতের পথ উন্মোচন করে দেয়।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, এসব সুফিদের জন্য আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আলী আত তিরমিযী 'রিয়াজাতুন নুফুস' নামে এক গ্রন্থ রচনা করে। এ গ্রন্থে সে উল্লেখ করে যে, তাসাওউফের পথে যারা নতুন সাধক তাদের কর্তব্য হলো, আল্লাহর নিকট তাওবা স্বরূপ

একাধারে দুই মাস রোজা রাখা। অতঃপর রোজা পরিহার করে প্রতিদিন অল্প পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করা।

তাদের জন্য এটাও কর্তব্য যে, তারা তরকারী, ফলমুল, সুস্বাদু খাবার, সাথী-সঙ্গীদের সাথে ওঠা-বসা ও কিতাব অধ্যয়ন পরিহার করবে; কেননা এগুলো নফসকে আনন্দিত করে। তাই সুফিদের উচিত নফসের জন্য আনন্দদায়ক সকল বস্তু পরিহার করা, যেন নফস দুঃখে পরিপূর্ণ হয়।

সুফিদের উল্লিখিত কাজ-কর্ম শরীয়ত পরিপন্থী এবং তা যে শয়তানেরই নেক চক্রান্তের সুফল, এ বিষয়ে দলীলভিত্তিক আলোচনা আপনাদের সামনে পেশ করছি।

আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেন, সাহল বিন আবদুল্লাহর যে রীতি বর্ণিত হয়েছে তা শরীয়তে বৈধ নয়। কেননা সে নিজেকে এমন বিষয়ে বাধ্য করেছে যা তার ধারণ ক্ষমতার উর্ধ্বে। তদুপরি আল্লাহ তায়ালা রিজিক স্বরুপ বনী আদমকে গম দ্বারা সম্মানিত করেছেন এবং তার খড়কুটা চতুষ্পদ প্রণির জন্য নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং বনী আদমের জন্য উচিত নয় যে, তারা খড়কুটা ভক্ষণে চতুষ্পদ প্রণির সাথে প্রতিদ্বন্দিতা করবে। আর খরকুটায় এমন কোন খাদ্য আছে যা মানুষের ক্ষুধা নিবারণ করবে? তদুপরি এসব কর্মের অসারতা এতই সুস্পষ্ট যে, তা প্রত্যাখ্যান করা নিস্প্রয়োজন।

আবু হামেদ গাজ্জালী সাহল বিন আবদুল্লাহ থেকে আরো বর্ণনা করেন যে, সাহল বিন আবদুল্লাহর মতামত হলো, ক্ষুধাজনিত কারণে যে ব্যক্তি দুর্বল হয়েছে তার বসে নামাজ পড়া ঐ ব্যক্তির দাঁড়িয়ে নামাজ

থেকে উত্তম, যে খাদ্য গ্রহণের কারণে দাঁড়ানোর সক্ষমতা লাভ হয়েছে।

আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেন, সাহল বিন আবদুল্লাহর এ কথা সম্পূর্ণ ভুল, বরং খাদ্যগ্রহণে যদি দাঁড়ানোর সক্ষমতা হাসিল হয় তাহলে তার খাদ্যগ্রহণও একপ্রকার এবাদত; কেননা খাদ্য মানুষকে এবাদত পালনে সাহায্য করে। আর যদি সে খাদ্য গ্রহণে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও পানাহার থেকে বিরত থাকার দরুন ক্ষুধার যন্ত্রণায় বসে নামাজ পড়ে তাহলে তার পানাহার থেকে বিরত থাকা ফরয তরকের কারণ হলো। তাই পানাহারে সক্ষম থাকাবস্থায় তা পরিহার করা শরীয়তে বৈধ নয়। ক্ষুধা যন্ত্রণা বেড়ে গেলে মানুষের জন্যতো মৃতপ্রাণি ভক্ষণ পরিহার করাও বৈধ নয়, তাহলে এমন পরিস্থিতিতে হালাল খাদ্য পরিহার তার জন্য কিভাবে বৈধ হবে? তদুপরি এ ক্ষুধার মাঝে কোন্ কল্যাণ নিহিত আছে যা মানুষকে এবাদত থেকে বিরত রাখে কিংবা এবাদত পালনে বিঘ্ন ঘটায়?

আর জা'ফর হাদ্দাদের কথা, 'আমি ইলম ও এক্বিনের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে চিন্তা করছি, যার শ্রেষ্ঠত্ব আমার দীলে প্রাধান্য পাবে আমি তার অনুসরণ করবো' এতো নিরেট মূর্খতা। কেননা ইলম ও এক্বিনের মাঝে কোন ব্যবধান নেই। ইলমের সর্বোচ্চ স্তরের নামই এক্বিন। আর ক্ষুধার্ত হলে পানাহার বর্জনের কথা ইলম-এক্বিনের কোথায় আছে? এরা এমন সম্প্রদায় যারা নিজেদের আবিস্কৃত বিষয়ে কঠোরতা অবলম্বন করেছে। এরা কঠোরতায় কোরাইশের সাদৃশ্যতা অবলম্বন করেছে। কেননা নিজেদের আবিস্কৃত বিষয়ে কঠোরতা অবলম্বনের কারণেই কোরাইশকে হুমছ বলা হয়। ফলে তারা মূলকে অস্বীকার করেছে, আর শাখাগত বিষয়ে কঠোরতা আরোপ করেছে।

আর যুন্নুন মিসরীর কথা, 'তুমি চুর্ণিত লবন খাও, তুমি সফল হতে পারবেনা' এতো এক ভিত্তিহিন কথা। কেননা এমন ব্যক্তি সম্পর্কে এ কথা কিভাবে বলা যায় যে এমন বস্তু ব্যবহার করে যা শরীয়তে বৈধ! তদুপরি এ নিন্দাকারী যে যবের ছাতু খায়, তাতো মানুষের দেহে কুলানজা রোগ সৃষ্টি করে।

আর যে ব্যক্তি বলে যে, মধু দ্বারা মাখন খাওয়া অপচয়; তার এ কথাকে শরীয়ত বর্জিত ঘোষণা করে। কেননা অপচয়তো এমন একটি বিষয় যা শরীয়তে নিষিদ্ধ, আর এটাতো এমন একটি বিষয় যার অনুমতি শরীয়তে বিদ্যমান। এক বিশুদ্ধ সনদে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি খেজুর দ্বারা শসা খেতেন এবং মিষ্টান্ন ও মধু পসন্দ করতেন।

আর সাহল বিন আবদুল্লাহ যে বলেছেন, 'আমি আমার শক্তি ও আক্বলকে সাতভাগে ভাগ করেছি' তার এ কাজ নিন্দার যোগ্য, প্রশংসার যোগ্য নয়। এ ধরনের কাজ শরীয়ত নির্দেশিত নয়, বরং তা হারামের নিকটবর্তী। কেননা এমন কাজ নিজের প্রতি যুলুমের শামিল এবং দেহের হক্ব নষ্টের উপায়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, إن لجسدك عليك حقا অর্থঃ নিশ্চয় তোমার প্রতি রয়েছে তোমার দেহের হক্ব।

আর আবু আবদুল্লাহ বিন যায়দ যে বলেছেন, 'আমি আজ চল্লিশ বছর যাবত এমন অবস্থায় উপনিত হওয়ার আগে খাদ্য গ্রহণ করি নি, যে অবস্থায় উপনিত হলে শরীয়ত মৃতপ্রাণি খাওয়ার অনুমতি দেয়' তার এ কাজ ইসলাম সমর্থিত নয়, বরং নিকৃষ্ট চিন্তার বশীভূত হয়েই সে এমনটি করেছে। তদুপরি সে হালাল খাদ্য বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তা পরিহার করে নিজের উপর যুলুম করেছে।

আর আবু ইয়াজিদের কথা, 'আল্লাহর আনুগত্যই আমাদের খাদ্য' এটি তার মনগড়া কথা। কেননা খাবারের মুখাপেক্ষী করেই দেহকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এমনকি জাহান্নামবাসী জাহান্নামের ভিতর খাবারের মুখাপেক্ষী হয়ে খাবার তলব করবে।

আর দীর্ঘদিন ক্ষুধার্ত থাকার পর তরমুজের খোসা খাওয়ার উপর আবুল হাসান নাসিবী যে নিন্দা করেছেন তার ভিত্তি শরীয়তে নেই।

আর যে ব্যক্তি সাতদিন পানাহার থেকে বিরত রয়েছেন সেং শরীয়তের নিন্দা থেকে মুক্ত নয়। অনুরূপভাবে শিঙ্গা লাগানোর সময় যে ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করেছে যে, আমি খাবোনা এবং সে কারণে সে দুর্বল হয়ে পড়েছে, তার এ কাজ শরীয়তে বৈধ নয়। আর ইবরাহিম যে তাকে বলেছে, 'হে সাধনার জগতে নব আগমনকারী, তুমি বড় ভালো কাজ করেছো' তার এ কথা সম্পূর্ণ ভুল। কেননা এমন পরিস্থিতিতে এ ব্যক্তির উচিত ছিলো বাধ্যতামূলকভাবে খাদ্য গ্রহণ করা, যদিও তা রমযান মাসে হোক। কেননা শরীয়তের বিধান হলো, যে ব্যক্তি একাধারে কয়েকদিন রোজা রাখার পর দুর্বল হয়েছে এবং শিঙ্গা লাগানোর পর চেতনাশক্তি বিলুপ্ত হয়েছে, তার জন্য রোজা রাখা বৈধ নয়।

এক বিশুদ্ধ সনদে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, من أصابه جهد في رمضان فلم يفطر فمات دخل النار. অর্থঃ যে ব্যক্তি রমযানে ভীষণ ক্লান্ত হবে, সে যদি রোযা ভঙ্গ না করে এবং সে কারণে তার মৃত্যু ঘটে তাহলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

আর ইবনে খফীফের স্বল্প পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ এমন একটি কাজ শরীয়ত যার নিন্দা করে, শরীয়তে এরূপ কাজের প্রশংসা অবিদ্যমান। আর প্রশংসার উদ্দেশ্যে তাদের কর্মসমূহ এমন ব্যক্তিই বর্ণনা করে

শরীয়তের বিধি-বিধান যার অজানা।

আর গোস্ত খাওয়া থেকে বিরত থাকা এটাতো বারাহিমাদের মাযহাব, যারা প্রাণী জবেহ করাকে অবৈধ মনে করে। অথচ কোন্ খাদ্য মানুষের দেহের জন্য কল্যাণকর সে বিষয়ে আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন। তাই দেহকে শক্তিশালী করার জন্য তিনি গোস্তকে হালাল করেছেন। কেননা গোস্ত মানুষের শক্তি বৃদ্ধি করে আর তা না খাওয়া মানুষের দেহকে দুর্বল করে এবং স্বভাব নষ্ট করে। স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামও গোস্ত খেতেন এবং বকরীর রান পসন্দ করতেন। তিনি একদিন আয়েশার গৃহে প্রবেশ করলে তার সামনে গৃহের স্বাভাবিক খাবার পেশে করা হলে তিনি বললেন, ألم أر

لكم برمة تفور আমিতো ঘরের ডেগ থেকে গোস্তের ঘ্রাণ পাচ্ছি।

হযরত হাসান বসরী প্রতিদিন গোস্ত ক্রয় করতেন।

আমাদের পূর্বসুরি হক্কানী ওলামায়ে কেরাম এমনই ছিলেন। তবে যারা তাদের মাঝে দরিদ্র ছিলেন এবং দারিদ্রতার কারণে গোস্ত খেতে অক্ষম ছিলেন তাদের বিষয় ভিন্ন। পক্ষান্তরে যে তার দেহ-মনের চাহিদা সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিয়েছে তার এ কাজ যথার্থ নয়। কেননা আল্লাহ তায়ালা মানব জাতিকে উষ্ণতা, শীতলতা, শুষ্কতা ও আদ্রতার সমম্বয়ে সৃষ্টি করেছেন; এবং শরীরের দেহরস তথাঃ- রক্ত, কফ, হলুদপিত্ত ও কালোপিত্তের ভারসাম্যতার উপর তার সুস্থতা নির্ভরশীল করেছেন। তাই শরীরের কোন দেহরস যদি কখনো বৃদ্ধি পায় তাহলে শরীর এমন খাদ্যের মুখাপেক্ষী হবে যা বেড়ে যাওয়া দেহরসকে নিয়ন্ত্রণে আনবে। উদাহরণ স্বরূপঃ- যদি কারো পিত্ত বেড়ে যায় তাহলে দেহ টক খাবারের মুখাপেক্ষী হবে, আর যদি কারো কফ কমে যায় তাহলে দেহ কোমল পানীয়র মুখাপেক্ষী হবে।

সুতরাং মানুষের দেহ বিভিন্ন প্রকার খাবারের মুখাপেক্ষী। তাই দেহ যখন কোন খাদ্যের মুখাপেক্ষী হয় তখন যদি সে খাদ্যগ্রহণ থেকে দেহকে বিরত রাখা হয় তাহলে দেহ ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং তা হবে আল্লাহর সৃষ্ট নেযামের বিরোধিতা। তাই এ ধরনের কাজ শরীয়ত ও আক্বল বিরোধী।

সকলেই এ বিষয়ে অবগত যে, মানুষের দেহ তার বাহন। সুতরাং যে তার বাহনের সাথে কোমল আচরণ না করবে সে কিভাবে গন্তব্যে পৌছবে! কিন্তু বড়ই আফসোসের বিষয়; জ্ঞান স্বল্পতার দরুন এসব সুফিরা নিজের মনগড়া আমল করে এবং নিজেদের কর্ম অনুসরণে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। আবার কখনো নিজের মতের স্বপক্ষে এমন দলীল পেশ করে যার কোনটা বানোয়াট আর কোনটা দুর্বল, আবার কখনো সহীহ হাদীসের মর্ম উদ্ঘাটনে অক্ষমতার দরুন মানুষের নিকট ভুল ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে।

আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেন, খাবার অধিক তৃপ্তি সহকারে খাওয়া নিন্দনীয়। খাদ্যগ্রহণের সর্বোত্তম পন্থা সেটাই যা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন। মেকদাম বিন মা'দী কারুবা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فان كان لا بد فثلث طعام وثلث شراب وثلث لنفسه অর্থঃ বনী আদম যেসব পাত্র পূর্ণ করে তন্মধ্যে নিকৃষ্টতম হলো, খাবার দ্বারা উদর পূর্ণ করা। এ পরিমাণ খাদ্য গ্রহণই বনী আদমের জন্য যথেষ্ট যা তার কোমরকে সোজা রাখবে। যদি সে এতে সন্তুষ্ট না হয় তাহলে পেটের এক তৃতীয়াংশ খাদ্য দ্বারা ও এক তৃতীয়াংশ পানি দ্বারা পূর্ণ করবে এবং এক তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য খালি রাখবে।

আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেন, সুফিরা কেবল যুবক ও তাসাওউফের নবীন সাধকদের অল্পাহারের নির্দেশ দেন। অথচ যুবকদের জন্য ক্ষুধাই সবচে' ক্ষতিকর। কেননা বৃদ্ধ ও পরিণত বয়সের লোকেরা ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করতে পারে, কিন্তু ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা যুবকদের নেই। আর যুবকরা ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করতে অক্ষম হওয়ার কারণ হলো, যৌবনের তেজ খুব তীব্র: তাই যুবকদের হজমশক্তি ভালো হওয়ার কারণে পেট দ্রত খালি হয়ে যায়, ফলে তারা অধিক ভোজনের মুখাপেক্ষী হয়, যেভাবে নতুন বাতি প্রচুর তেলের মুখাপেক্ষী হয়। সুতরাং যদি কেউ যৌবনের শুরুতেই ক্ষুধা সহ্য করে এবং এটাকে তার অভ্যাসে পরিণত করে তাহলে তার উদ্যমতা নিষ্প্রোভ হয়ে যাবে।

এবার শুনুন যে অল্পাহার মানুষের দেহকে দুর্বল করে সে বিষয়ে অভিজ্ঞ ওলামাদের মতামত।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে উকবাহ বিন মুকাররম বললেন, এইযে লোকেরা খাবার অল্প পরিমাণে ভক্ষণ করে এবং খাবারের ব্যাবস্থাপনায় নির্লিপ্ত থাকে এ বিষয়ে আপনার কী অভিমত? তিনি বললেন, তাদের বিষয়টি আমাকে মুগ্ধ করেনা। তিনি আরো বলেন, আমি আবদুর রহমান বিন মাহদিকে বলতে শুনেছি, সুফিদের এসব কর্ম তাদেরকে ফরয আদায়ে বিরত রাখে।

ইসহাক্ব বিন দাউদ বলেন, আমি আবদুর রহমান বিন মাহদিকে বললাম, হে আবু সাঈদ! আমাদের দেশেতো এক সুফি সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটেছে। তিনি আমাকে বললেন, তুমি এদের নিকটবর্তী হয়োনা। কেননা আমি এদের এক সম্প্রদায়কে দেখেছি, যাদেরকে তাদের কাজ-কর্ম উন্মাদ করে তোলে, আবার কতককে নিয়ে যায় নাস্তিকতার দিকে। অতঃপর তিনি বলেন, একবার সুফিয়ান সাওরী

সফরে বের হলে আমিও তার অনুসরণ করি। আমি দেখলাম তার সফরে আনা খাদ্যের মাঝে ফালুদাও রয়েছে।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে এক ব্যক্তি বললো, আজ পনেরো বছর যাবৎ ইবলিছ আমাকে আকৃষ্ট করছে। অধিকাংশ সময় ওসওয়াসাগ্রস্ত হয়ে আমি আল্লাহর বিষয়ে চিন্তা করি। তখন ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বললেন, সম্ভবত তুমি নিয়মিত রোযা রাখতে অভ্যস্ত ছিলে। তুমি রোযা রাখা বন্ধ করে চর্বিযুক্ত খাবার ভক্ষণ করো এবং গল্পকারদের সাথে ওঠাবাসা করো।

আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেন, এসব সুফিদের এক সম্প্রদায় এমন, যারা নিকৃষ্ট খাবর ভক্ষণ করে এবং চর্বিযুক্ত খাবার বর্জন করে। ফলে তার পাকস্থলীতে নিকৃষ্ট খাবার একত্রিত হলে এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পাকস্থলী তা থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে। কেননা পাকস্থলী সর্বদাই এমন কিছুর দাবি করে যা সে হজম করবে। সুতরাং পাকস্থলীতে যখন নিকৃষ্ট খাবার একত্রিত হয় এবং পাকস্থলী তা হজম করে শরীরে খাদ্য সরবারাহ করে, তখন সেই নিকৃষ্ট খাদ্য তার মাঝে ওসওয়াসা, উন্মাদতা ও মন্দ স্বভাবের আবির্ভাব ঘটায়।

এসব অল্পভোজনকারীরা অল্পভোজনে অভ্যস্ত হওয়ার দরুন তাদের পাকস্থলী ক্রমান্বয়ে সঙ্কুচিত হয়, ফলে এক পর্যায়ে একবার খাদ্যগ্রহণে তারা দীর্ঘদিন অনাহারে কাটাতে পারে। আর এ ক্ষেত্রে যে বিষয়টি তাদেরকে সহযোগিতা করে তা হচ্ছে যৌবনের শক্তি। ফলে হাকীকত সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার দরুন তারা দীর্ঘদিন অনাহারে থাকতে পারাকে কারামাত মনে করে।

আবদুল মুনঈম বিন আবদুল করিম তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, এক মহিলা বয়োবৃদ্ধ হওয়ার পর তাকে তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, আমি যৌবনকালে অল্পাহার সত্ত্বেও

কয়েকদিন অনাহারে থাকতে পারতাম, ফলে বিষয়টিকে আমি কারামত মনে করতাম। কিন্তু বয়স বৃদ্ধির সাথে আমার দেহশক্তি যখন লোপ পেলো তখন বুঝতে পারলাম যে তা কারামত নয়, বরং তা ছিলো আমার যৌবনশক্তি; যাকে আমি কারামত মনে করেছি।

আবদুল মুনঈম আরো বলেন, আমি আবু আলী দাক্কাককে বলতে শুনেছি, যে বয়োবৃদ্ধ লোক এ ঘটনা শ্রবণ করেছে সে এই বৃদ্ধার প্রতি সদয় হয়েছে এবং বলেছে, নিশ্চয় সে ন্যায়সঙ্গত কথা বলেছে।

আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেন, কারো মনে এ প্রশ্ন আসতে পারে যে, আপনারা কিভাবে অল্পাহার থেকে বারণ করছেন; অথচ আপনারাই বর্ণনা করেছেন যে, ওমর বিন খাত্তাব (রা.) দিনে মাত্র এগারো লোকমা খাদ্য গ্রহণ করতেন। ইবনে যোবায়ের এক সপ্তাহকাল অনাহারে থাকতেন। ইবরাহিম তামিমী একাধারে দুইমাস অনাহারে ছিলেন।

উত্থাপিত এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলবো, অনাকাঙ্খিতভাবেই মানুষকে কতক সময় অল্পাহার ও অনাহারে কাটাতে হয়। তবে এসব মহাপুরুষরা এ বিষয়ের উপর অটল থাকেন নি এবং ক্রমান্বয়ে অল্পাহার ও অনাহারকে তাদের অভ্যাসে পরিণত করার চেষ্টাও করেননি।

আমাদের পূর্বসূরিদের কতক অনাহারে থাকতেন দারিদ্রতার কারণে। আবার অনাহারে থাকা তাদের কারো অভ্যাসে পরিণত হওয়ায় অনাহার তাদের দেহকে দূর্বল করতোনা এবং অনাহারের প্রভাব তাদের এবাদত-বন্দেগীতে পরিলক্ষিত হতোনা। আরবের কতক লোকতো এমনও আছেন যারা দুধ পান করেই দীর্ঘদিন কাটাতে পারেন।

তবে এ বিষয়টিও ভালোভাবে বুঝে নিন যে, আমরা অধিক ভোজনের নির্দেশ দিচ্ছিনা, বরং এমন ক্ষুধা থেকে বারণ করছি যা শক্তিকে দুর্বল করে এবং দেহকে নিস্তেজ করে। কেননা দেহ যদি দুর্বল হয়ে যায় তাহলে এবাদতে মন বসেনা এবং বেশি পরিমাণে এবাদত করাও তার পক্ষে সম্ভব হয়না।

হযরত আনাস (রা.) বলেন, ওমর বিন খাত্তাবের সামনে এক সা পরিমাণ খেজুর রাখা হতো, আর তিনি খেতে খেতে এক পর্যায়ে সব ফুরিয়ে ফেলতেন।

ইবরাহিম বিন আদহামের ঘটনাতো এমন, তিনি একবার মাখন, মধু ও রুটি ক্রয় করলে তাকে বলা হলো, আপনি কী এগুলো সব খাবেন? তিনি উত্তরে বললেন, আমরা যখন পাই তখন শক্তিবান পুরুষের ন্যায় খাই, আর যখন না পাই তখন মহাপুরুষদের ন্যায় ধৈর্য ধারণ করি।

আর স্বচ্ছপানি ও ঠান্ডাপানি পান করা থেকে যারা নিজেদেরকে বিরত রাখতো তাদের এ কর্মের জবাব হলো, স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঠান্ডা-স্বচ্ছপানি পসন্দ করতেন।

জাবের বিন আবদুল্লাহ বলেন,

عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أتى قوما من الأنصار يعود مريضا فاستسقى وجدول قريب منه فقال ان عندكم ماء بات في شن وإلا كرعنا اخرجه البخاري

অর্থঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার আনসারদের এক অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে এসে পানি চাইলেন। ঐ আনসারীর বাড়ির নিকটেই একটি নদী ছিলো। তিনি বললেন, যদি তোমাদের নিকট কলসে রাখা রাতের পানি থাকে তাহলে তা নিয়ে

আসো, অন্যথায় আমরা নদী হতেই চুমুক দিয়ে পানি পান করবো। (বুখারী)

আয়েশা (রা.) বলেন, أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يستقي له الماء العذب من بئر السقيا. অর্থঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য সুকইয়া কুপ হতে মিষ্টপানি সংগ্রহ করা হতো।

আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেন, কতক সুফিদের বক্তব্য হলো, যদি মানুষ উত্তম খাবার ভক্ষণ করে এবং ঠান্ডাপানি পান করে তাহলে কখন তার মাঝে মৃত্যুর ভালোবাসা পয়দা হবে! অনুরূপভাবে আবু হামেদ গাজ্জালীও বলেন, যদি মানুষ সুস্বাদু খাবার ভক্ষণ করে তাহলে তার অন্তর কঠিন হবে এবং মৃত্যু তার নিকট অপসন্দনীয় হবে।

আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেন, হায় আফসোস; একজন অভিজ্ঞ ফক্বীহের জবান থেকে এরূপ কথা কিভাবে বের হতে পারে! আচ্ছা বলুনতো, যদি কেউ নানামুখী শাস্তির সম্মূখীন হয় তবুও কী সে মৃত্যুকামনা করবে?

এছাড়াও মানুষের জন্য নিজেকে শাস্তি দেয়া কিভাবে বৈধ হবে! অথচ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ অর্থঃ তোমরা নিজেকে হত্যা করোনা।

সফরাবস্থায় আমাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে রোযা ভঙ্গের সুযোগ দিয়ে বলেছেন, يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ অর্থঃ আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজতা চান, কঠিনতা চান না।

আর কেনইবা আমরা শরীরের প্রতি যত্নবান হবোনা, অথচ জান্নাত নামক গন্তব্যে পৌছার জন্য দেহই আমাদের একমাত্র বাহন।

আর আবু ইয়াযিদ যে একবছরকাল পানি পান হতে বিরত থেকে নিজেকে কষ্ট দিয়েছে তার জবাব হলো, শরীয়ত তার এ কাজের নিন্দা করে। তার কাজের প্রশংসা কেবল ঐ ব্যক্তি করবে যে শরীয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ।

তার এ কাজ নিন্দিত হওয়ার কারণ হলো, মানুষের উপর তার দেহের হক্ব রয়েছে, আর হক্বদারের হক্ব প্রদানে বাঁধাদান করা একপ্রকার জুলুম। তাই মানুষের জন্য বৈধ নয় যে, সে তার নিজেকে কষ্ট দিবে এবং গ্রীষ্মকালে এ পরিমাণ সময় রোদে এবং শীতকালে এ পরিমাণ সময় বরফে বসে থাকবে যা তার দেহের জন্য কষ্টকর।

আর পানি দেহের আদ্র উপাদানগুলোকে সুস্থ রাখে এবং দেহে শক্তি সঞ্চালনের ক্ষেত্রে খাদ্যকে কার্যকর করে।

এ বিষয়ে সকলেই সংবিদিত যে, খাদ্যের মাধ্যমেই দেহ সবল থাকে। সুতরাং কেউ যদি শরীরকে দানাপানি থেকে বিরত রাখে কিংবা পর্যাপ্ত পরিমাণ দানাপানি গ্রহণ না করে তাহলে সেতো দেহের ক্ষতি সাধন করলো। অথচ তাদের জানা নেই যে, তারা যা উত্তম ভেবে করছে তা এক নিকৃষ্টতম ভুল।

অনুরূপভাবে দেহকে ঘুম থেকে বিরত রাখাও এক প্রকার যুলুম। ইবনে আক্বিল বলেন, মানুষের জন্য বৈধ নয় যে, সে তার নিজের উপর শাস্তি প্রয়োগ করবে কিংবা নিজের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। যদি কেউ এমনটি করে তাহলে ইমাম তার উপর শাস্তি প্রয়োগ করবে।

এসব জীবন মানুষকে আল্লাহ আমানত স্বরূপ দিয়েছেন, তাই মানুষের জন্য উচিত নয় যে, সে আল্লাহর আমানতে খেয়ানত করবে। এমনকি

মালিকানাধিন মাল ব্যবহারের পূর্ণ স্বধিনতাও আল্লাহ মানুষকে দেননি, বরং মাল খরচের পথ ও পন্থা আল্লাহ মানুষের জন্য নির্ধারণ করেছেন।

আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেন, হিজরতের হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা সফরের জন্য পাথেয় স্বরূপ খাদ্য-পানীয় সাথে নিয়েছেন। আর আবু বকর (রা.) পাথরের ছায়ায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য বিছানা বিছিয়েছেন এবং পাত্রে দুধ দোহনের পর তার উপর পানি ঢেলেছেন, যেন পেটের তলদেশ ঠান্ডা হয়। আর এসবের একমাত্র উদ্দেশ্য দেহের প্রতি কোমলতা প্রদর্শন।

আর অল্পাহারের ব্যাপারে আবু তালেব মক্কী যা বলেছেন তাতো দেহের উপর এমন যুলুম যা দেহকে দুর্বল করে দেয়। অবশ্য ক্ষুধা যদি পরিমিত হয় তাহলে তা প্রশংসা থেকে মুক্ত নয়।

আর মুহাম্মদ বিন আলী আত তিরমিযী যা রচনা করেছেন তাতে মনে হয় তিনি যেন তার নষ্ট চিন্তা দ্বারা এক নতুন শরীয়ত আবিস্কার করতে চাচ্ছেন। তাওবার সময় একাধারে দুইমাস রোযা রাখার কী ভিত্তি শরীয়তে বিদ্যমান রয়েছে! আর ফলমুল ও বৈধ খাবার পরিহারের মাঝে কোন উপকারিতা নীহিত আছে! সুতরাং কিতাব অধ্যয়নের সৌভাগ্য যার লাভ হয়নি সে কার আদর্শ অনুসরণ করবে!

এখানে আমরা এমন কিছু হাদীস পেশ করবো যা থেকে সুফিদের কথা-কাজের অসারতা স্পষ্টরূপে ফুটে উঠবে।

عن سعيد بن المسيب قال جاء عثمان بن مظعون إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال يا رسول الله غلبني حديث النفس فلم أحب أن أحدث

شيئاً حتى أذكر لك ذلك فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وما
تحدثك نفسك يا عثمان" قال تحدثني نفسي بأن أختصي فقال: "مهلا
يا عثمان فإن خصي أمتي الصيام" قال يا رسول الله فإن نفسي تحدثني
أن أترهب في الجبال قال: "مهلا يا عثمان فإن ترهب أمتي الجلوس في
المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة" قال يا رسول الله فإن نفسي
تحدثني بأن أسيح في الأرض قال: "مهلا يا عثمان فإن سياحة أمتي الغزو
في سبيل الله والحج والعمرة" قال يا رسول الله فإن نفسي تحدثني بأن
أخرج من مالي كله قال: "مهلا يا عثمان فإن صدقتك يوما بيوم وتكف
نفسك وعيالك وترحم المسكين واليتيم وتطعمه أفضل من ذلك" قال
يا رسول الله فإن نفسي تحدثني بأن أطلق خولة امرأتي قال: "مهلا يا
عثمان فإن هجرة أمتي من هجر ما حرم الله عليه أو هاجر إلي في حياتي أو
زار قبري بعد موتي أو مات وله امرأة أو امرأتان أو ثلاث أو أربع" قال يا
رسول الله فإن نفسي تحدثني أن لا أغشاها قال: "مهلا يا عثمان فإن
الرجل المسلم إذا غشي أهله فإن لم يكن من وقعته تلك ولد كان له
وصيف في الجنة فإن كان من وقعته تلك ولد فإن مات قبله كان له فرطا
وشفيعاً يوم القيامة وإن كان بعده كان له نورا يوم القيامة" قال يا رسول
الله فإن نفسي تحدثني أن لا آكل اللحم قال: "مهلا يا عثمان فإني أحب

اللحم وآكله إذا وجدته ولو سألت ربي أن يطعمني إياه كل يوم لأطعمني" قال يا رسول الله فان نفسي تحدثني أن لا أمس طيبا قال: "مهلا يا عثمان فان جبريل أمرني بالطيب غبا ويوم الجمعة لا مترك له يا عثمان لا ترغب عن سنتي فمن رغب عن سنتي ثم مات قبل أن يتوب صرفت الملائكة وجهه عن حوضي" قال المصنف رحمه الله هذا حديث عمير بن مرداس.

অর্থঃ সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব বলেন, ওসমান বিন মাযউন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! মনের কথা আমাকে প্রভাবিত করে; তাই আপনার নিকট তা বর্ণনা করা পর্যন্ত আমি অন্য আলোচনা অপসন্দ করি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার নফস তোমাকে কী বলে হে ওসমান! ওসমান বললেন, আমার নফস আমাকে বলে, আমি যেন পুরুষত্বহীন হই। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ধীর হে ওসমান! আমার উম্মতের পুরুষত্বহিনতা রোযার মাঝে নিহিত। ওসমান বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমার নফস আমাকে বলে, আমি যেন সংসারত্যাগপূর্বক পাহাড়ে গিয়ে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর এবাদত করি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ধীরে হে ওসমান! আমার উম্মতের এবাদতে একনিষ্ঠতা, মসজিদে বসে থাকা এবং এক নামাজের পর অন্য নামাজের অপেক্ষা করার মাঝে নিহিত। ওসমান বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমার নফস আমাকে বলে, আমি যেন

যমীনে ভ্রমণ করি। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ধীরে হে ওসমান! আমার উম্মতের ভ্রমণ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ও হজ্জ-ওমরার মাঝে নিহিত।

ওসমান বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমার নফস আমাকে বলে, আমি যেন আমার সমস্ত মাল সদক্বা করে দেই। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ধীরে হে ওসমান! তোমার মাঝে মাঝে সদক্বা করা, নিজ সম্পদ দ্বারা নিজেকে ও পরিবারকে অন্যের দারস্থ হওয়া থেকে বিরত রাখা এবং এতিম-মিসকীনদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে তাদেরকে আহার করানো সমস্ত মাল সদক্বা করা হতে উত্তম।

ওসমান বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমার নফস আমাকে বলে, আমি যেন আমার স্ত্রীকে তালাক দেই। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ধীরে হে ওসমান! আমার উম্মতের মুহাজির হলো, যে নিষিদ্ধ বস্তু বর্জন করে, অথবা আমার জীবদ্দশায় আমার নিকট হিজরত করে, অথবা আমার মৃত্যুর পর আমার কবর জিয়ারত করে, অথবা যে এক, দুই, তিন কিংবা চারজন স্ত্রী রেখে মৃত্যুবরণ করে। ওসমান বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমার নফস আমাকে বলে, আমি যেন স্ত্রী সহবাস না করি। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ধীরে হে ওসমান! কোন মুসলমান বান্দা যখন স্ত্রী সহবাস করে, আর সেই সহবাস থেকে যদি সন্তান জন্ম না নেয় তাহলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একজন খাদেম সৃষ্টি করবেন। আর যদি সেই সহবাস থেকে কোন সন্তান জন্ম নেয় এবং সেই সন্তান পিতার পূর্বে মৃত্যুবরণ করে তাহলে সে কেয়ামতের দিন তার জন্য সুপারিশকারী হবে। আর যদি

সে পিতার পরে মৃত্যুবরণ করে তাহলে কেয়ামতের দিন সে পিতার জন্য নূর হবে। ওসমান বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমার নফস আমাকে বলে, আমি যেন গোস্ত না খাই। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ধীরে হে ওসমান! আমিতো গোস্ত পসন্দ করি এবং তা ভক্ষণ করি। আমি যদি আমার রবের নিকট প্রতিদিন গোস্ত খাওয়ার আবদার করি তাহলে আমার রব তা আমাকে খাওয়াবেন।

ওসমান বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমার নফস আমাকে বলে, আমি যেন সুগন্ধি স্পর্শ না করি। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ধীরে হে ওসমান! জিবরাঈল (আ.) আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন জুমআর দিন ও মাঝে মাঝে সুগন্ধি ব্যবহার করি। হে ওসমান! আমিও তোমাকে তা ব্যবহারের নির্দেশ দিচ্ছি। তুমি আমার সুন্নাত থেকে বিমুখ হয়োনা; কেননা যে আমার সুন্নাত থেকে বিমুখ হবে, অতঃপর তা থেকে তাওবা করার পূর্বে তার মৃত্যু এসে যাবে, তাহলে ফেরেশতারা কেয়ামতের দিন আমার হাউজ থেকে তার চেহারা ঘুরিয়ে দিবে। আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেন, এটি ওমায়ের বিন মারদাসের হাদীস।

عن أبي بردة قال دخلت امرأة عثمان بن مظعون على نساء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرأينها سيئة الهيئة فقلن لها مالك فما في قريش رجل أغنى من بعلك قالت ما لنا منه شيء أما ليلة فقائم وأما نهاره فصائم فدخلن إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكرن ذلك له فلقيه فقال: "يا عثمان أما لك بي أسوة" فقال بأبي وأمي أنت وما ذاك قال: "تصوم النهار وتقوم

الليل" قال إني لأفعل قال: "لا تفعل أن لعينك عليك حقا وإن لجسدك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا فصل ونم وصم وافطر"

অর্থঃ আবু বুরদা বলেন, একদিন ওসমান বিন মাযউনের স্ত্রী রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের নিকট গমন করলে তারা তার দুরাবস্থা দেখে বললেন, বড় অদ্ভুত ব্যাপারতো; তোমার স্বামী কোরাইশের সবচে' ধনী ব্যক্তি, অথচ তোমার এই দুরাবস্থা! তিনি বললেন, আমরা তার থেকে কোন সদাচার পাইনা। তার রাত কাটে নামাজে আর দিন অতিবাহিত হয় রোযারাখাবস্থায়। তখন নবীপত্নীগণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিষয়টি অবহিত করলে তিনি ওসমানকে বললেন, হে ওসমান! আমার মাঝে কী তুমি আদর্শ খুঁজে পাওনা? তিনি বললেন, আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য কোরবান হোক; দয়া করে বিষয়টি খুলে বলুন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি কী দিনভর রোযা ও রাতভর নামাজ পড়ো? তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! অবশ্যই আমি তা করি। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি এমনটি করোনা। কেননা তোমার উপর রয়েছে তোমার চোখের হক্ব, তোমার উপর রয়েছে তোমার দেহের হক্ব এবং তোমার উপর রয়েছে তোমার পরিবারের হক্ব; সুতরাং তুমি রাতের কিছু অংশে নামাজ পড়ো এবং কিছু অংশে ঘুমাও, একদিন রোযা রাখো অপর দিন রোযা ভঙ্গ করো।

عن أبي قلابة أن عثمان بن مظعون اتخذ بيتا فقعد يتعبد فيه فبلغ ذلك النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأتاه فأخذ بعضادتي باب البيت الذي هو

فيه وقال: "يا عثمان إن الله عز وجل لم يبعثني بالرهبانية مرتين أو ثلاثا" অর্থঃ হযরত আবু কিলাবা (রা.) বলেন, ওসমান বিন মাযউন (রা.) একটি ঘর নির্মাণ করে তাতে নিরবচ্ছিন্নভাবে এবাদত করতে শুরু করেন। বিষয়টি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতে পেরে তার নিকট গমন করে তার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন, হে ওসমান! আমাকেতো আল্লাহ তায়ালা সন্ন্যাসধর্ম দিয়ে প্রেরণ করেন নি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথাটি তিনবার বললেন।

عن كهمس الهلالي قال أسلمت وأتيت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأخبرته بإسلامي فمكثت حولا ثم أتيته وقد ضمرت ونحل جسمي فخفض في البصر ثم صعده قلت أما تعرفني قال: "ومن" أنت قلت أنا كهمس الهلالي قال: "فما بلغ بك ما أرى" قلت ما أفطرت بعدك نهارا ولا نمت ليلا قال: "ومن أمرك أن تعذب نفسك صم شهر الصبر ومن كل شهر يوما" قلت زدني قال: "صم شهر الصبر ومن كل شهر يومين" قلت زدني قال: "صم شهر الصبر ومن كل شهر ثلاثة أيام"

অর্থঃ কাহমাস হেলালী বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমার ইসলাম গ্রহণের বিষয়ে অবহিত করে নিজ এলাকায় চলে আসি। একবছর পর আমি পুনরায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাতে আসি। এই এক বছরে আমার দেহ শুকিয়ে আমি দুর্বল হয়ে যাই।

আমাকে দেখে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের চোখ ওঠানামা করলে আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আপনি কী আমাকে চিনছেন না? তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি কে? আমি বললাম, আমি কাহমাস হেলালী। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার এই সাস্থাবনতি কিভাবে হলো? আমি বললাম, আপনার সাক্ষাৎ লাভের পর হতে আজ পর্যন্ত আমি দিনে পানাহার করিনি এবং রাতে ঘুমাইনি। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, নিজেকে এরূপ কষ্ট দেয়ার নির্দেশ তোমায় কে দিয়েছে? তুমি এখন থেকে রমযানের পুরামাস আর প্রতিমাসে একদিন রোযা রাখবে। আমি বললাম, আরো বাড়িয়ে বলুন। তিনি বললেন, তুমি এখন থেকে রমযানের পুরামাস আর প্রতিমাসে দুইদিন রোযা রাখবে। আমি বললাম, আরো বাড়িয়ে বলুন। তিনি বললেন, তুমি এখন থেকে রমযানের পুরামাস আর প্রতিমাসে তিনদিন রোযা রাখবে।

عن أبي قلابة بلغ به صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن ناسا من أصحابه أحتموا النساء واللحم اجتمعوا فذكرنا ترك النساء واللحم فأوعدوا فيه وعيدا شديدا وقال: "لو كنت تقدمت فيه لفعلت" ثم قال: "إني لم أرسل بالرهبانية" অর্থঃ আবু কিলাবা বলেন, আমার মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এ সংবাদ পৌছলো যে, রাসুলের একদল সাহাবী স্ত্রীদের নিকটবর্তী হওয়া ও গোস্ত ভক্ষণ পরিহার করে একত্রে সমবেত হয়েছেন। তখন আমরাও স্ত্রীদের নিকটবর্তী না হওয়া এবং গোস্ত ভক্ষণ না করার বিষয়টি রাসুলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উল্লেখ করলে তিনি এ বিষয়ে কঠোরভাবে হুশিয়ার করে বললেন, যদি এরূপ করা আখেরাতের পথকে সুগম করতো তাহলে সর্বপ্রথম আমি তা করতাম। অতঃপর বললেন, আমি সন্ন্যাসধর্ম নিয়ে প্রেরিত হইনি।

আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেন, এক হাদীসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, إن الله عز وجل يحب أن يرى آثار نعمته على عبده في مأكله ومشربه অর্থঃ আল্লাহ তায়ালা বান্দার পানাহার ও বেশভুষায় তার নেয়ামতের নিদর্শন দেখতে পসন্দ করেন।

বকর বিন আবদুল্লাহ বলেন, যাকে আল্লাহ নেয়ামত দিয়েছেন এবং তার পানাহার ও বেশভূষায় নেয়ামতের নিদর্শন পরিলক্ষিত হয় তাকে হাবীবুল্লাহ (আল্লাহর প্রিয়) উপাধিতে ভূষিত করা হয়, আর যাকে আল্লাহ নেয়ামত দিয়েছেন কিন্তু তার পানাহার ও বেশভূষায় নেয়ামতের নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়না তাকে বাগীযুল্লাহ (আল্লাহর অপসন্দনীয়) উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

তাওয়াক্কুলের দাবি, আসবাব বর্জন ও মাল সংরক্ষণ না করার বিষয়ে সুফিদেরকে শয়তানের ধোঁকাদানের বিবরণ।

আহমদ বিন আবুল হাওয়ারী বলেন, আমি আবু সোলায়মান দারানীকে বলতে শুনেছি, যদি আমরা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করতাম তাহলে আমরা চোরের ভয়ে দেয়াল বানাতাম না এবং দরজায় তালা ঝুলাতাম না।

যুন্নুন মিসরী বলেন, আমি কয়েক বছর ভ্রমণ করেছি, কিন্তু এর ভিতর একবার ব্যতীত আল্লাহর প্রতি আমার তাওয়াক্কুল সহীহ্ হয়নি। আমি একদিন সমুদ্র ভ্রমণে ছিলাম। প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে আমাদের জাহাজ টুকরো টুকরো হয়ে যায়। তখন আমি জাহাজের একটি কাষ্ঠখন্ডের সাথে ভাসতে থাকি। একসময় মন আমাকে বললো, যদি আল্লাহ তোমার মৃত্যু পানিতে লিখে রাখেন তাহলে এই কাঠ তোমার কী উপকার করবে? তখন আমি কাঠ ছেড়ে পানিতে ভাসতে থাকি এবং পানির ঢেউ একপর্যায়ে আমাকে তীরে নিক্ষেপ করে।

হাফেজ আবু নুআঈম বলেন, জা'ফর খুলদী তার কিতাবে লিখেন, আমি জুনাইদ বাগদাদীকে বলতে শুনেছি, আমরা একবার দলবদ্ধ হয়ে আবু ইয়াকুব যায়্যাতের বাড়িতে গিয়ে দরজায় কড়া নাড়লে তিনি বললেন, আল্লাহর এবাদতে তোমাদের কী এমন ব্যস্ততা নেই যা তোমাদেরকে আমার নিকট আসতে বাঁধা দেয়। তখন আমি বললাম, আপনার নিকট আমাদের আগমনতো আল্লাহর এবাদতে ব্যস্ততারই অংশ। তখন আমরা তাকে তাওয়াক্কুল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি সাথে থাকা একটি দিরহাম বের করে আমাদেরকে তাওয়াক্কুলের সঠিক বর্ণনা দিয়ে বললেন, আমার কাছে সম্পদ বিদ্যমান থাকাবস্থায় তোমাকে তাওয়াক্কুলের ব্যাখ্যা দিতে আমি লজ্জাবোধ করেছি।

আবু নসর সিরাজ তার গ্রন্থ 'কিতাবুল লামা' তে উল্লেখ করেন, এক লোক আবদুল্লাহ বিন জালার নিকট এসে তাওয়াক্কুল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি কোন উত্তর না দিয়ে ঘরে প্রবেশ করেন। কিছুক্ষণ পর ঘর থেকে একটি থলে নিয়ে আসেন, যাতে চার দানেক ছিলো। তিনি দানেকগুলো উপস্থিত লোকদেরকে দিয়ে বললেন, তোমরা এগুলো দিয়ে কিছু ক্রয় করো। অতঃপর লোকটির নিকট তাওয়াক্কুলের ব্যাখ্যা পেশ করলে তাকে বলা হলো, আপনি এমনটি কেন করলেন? তিনি

বললেন, আমার নিকট চার দানেক থাকাবস্থায় আমি তাওয়াক্কুলের ব্যাখ্যা পেশ করতে লজ্জাবোধ করেছি।

আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেন, শরীয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে অজ্ঞতাই তাদের মনে এরূপ কল্পনা সৃষ্টি করেছে। এরা যদি তাওয়াক্কুলের বাস্তবতা জানতো তাহলে বুঝতো যে, আসবাব গ্রহণ তাওয়াক্কুল পরিপন্থী নয়। কেননা আল্লাহর প্রতি অন্তরের আস্থাকেই তাওয়াক্কুল বলে, আর তা দেহের মাধ্যমে আসবাব গ্রহণ ও মাল জমা করার পরিপন্থী নয়।

এবার শুনুন মালের প্রতি গুরুত্বারোপ সম্বলিত কিছু দলীলঃ

আল্লাহ তায়ালা বলেন, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. অর্থঃ তোমরা নির্বোধ মালিকদের হাতে ঐ সম্পদ অর্পণ করোনা যাকে আল্লাহ তোমাদের জীবন ধারণের উপজীব্য নির্ধারণ করেছেন।

অন্য আয়াতে আল্লাহ নির্বোধদের হাতে সম্পদ অর্পণে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে বলেন, فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ অর্থঃ যদি তাদের মাঝে ভালো-মন্দ বিচারের জ্ঞান অনুভব করো তাহলে তাদের সম্পদ তাদের নিকট ফিরিয়ে দাও।

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবী সা'দকে সম্বোধন করে বলেন, لأن تترك ورثتك أغنياء خير لك من أن تتركهم عالة يتكففون الناس অর্থঃ তুমি তোমার ওয়ারিশদেরকে স্বচ্ছল অবস্থায় রেখে যাওয়া তাদেরকে দারিদ্রাবস্থায় রেখে যাওয়া থেকে উত্তম, যেন তারা মানুষের দ্বারস্থ না হয়।

অন্য হাদীসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "نعم المال الصالح للرجل الصالح" অর্থঃ হালাল মাল সৎলোকের জন্য কতইনা উত্তম।

আরো ভালোভাবে জেনে রাখুন, যে আল্লাহ তাওয়াক্কুলের নির্দেশ দিয়েছেন তিনিই সতর্কতা অবলম্বনের আদেশ করেছেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, خُذُوا حِذْرَكُمْ অর্থঃ তোমরা সতর্কতা অবলম্বন করো।

অন্য আয়াতে আল্লাহ শত্রু মোকাবিলার জন্য বলেছেন, وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ অর্থঃ তোমাদের সাধ্য অনুপাতে তাদের মোকাবিলার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করো।

অন্য আয়াতে আল্লাহ মুসা আলাইহিস সালামকে শত্রু বাহিনী থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا অর্থঃ আমার বান্দাদের নিয়ে রাতে ভ্রমণ করুন।

স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম অস্ত্রাঘাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য একসাথে দুই লৌহবর্ম পরিধান করেছেন, রোগের বিষয়ে দুইজন চিকিৎসকের সাথে পরামর্শ করেছেন, শত্রুর ভয়ে পাহাড়ের গুহায় আত্মগোপন করেছেন, রাতে পাহাড়ার জন্য লোক নিযুক্ত করেছেন এবং ঘুমের পূর্বে দরজা বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

বুখারী, মুসলিমের হাদীসে হযরত জাবের (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "اغلق بابك" তুমি তোমার দরজা বন্ধ করো।

তিনি আমাদেরকে এ সংবাদও দিয়েছেন যে, সতর্কতা অবলম্বন তাওয়াক্কুল পরিপন্থী নয়।

আনাস বিন মালেক (রা.) বলেন, এক লোক তার উট মসজিদের সামনে ছেড়ে দিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে হাজির হলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে তার উট সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। লোকটি বললো, আমি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে তা মসজিদের সামনে ছেড়ে রেখেছি। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, আগে উট বাঁধো তারপর তাওয়াক্কুল করো।

ইবনে আক্বীল বলেন, মানুষ ধারণা করে যে, সতর্কতা ও সংরক্ষণ তাওয়াক্কুল পরিপন্থী। তাই কোন ব্যক্তি আল্লাহর উপর আস্থাশীল তখনই হবে যখন সে কর্মপরিণতির চিন্তা পরিহার করবে এবং মাল সংরক্ষণে উদাসীন হবে। অথচ তারা যা ধারণা করছে তাকে অভিজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম অক্ষমতা ও অবহেলা প্রদর্শন বলে আখ্যায়িত করেন, আর বিবেকবান মানব সমাজ তার নিন্দা করেন।

আল্লাহ তায়ালাতো বান্দাকে সতর্কতা অবলম্বন ও সংরক্ষণের ব্যাপারে সাধ্যানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের পরেই তাওয়াক্কুলের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা তার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ অর্থঃ নবী হে! আপনি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সাহাবাদের সাথে পরামর্শ করুন, পরামর্শের পর যে সিদ্ধান্তে আপনি উপনিত হবেন তা বাস্তবায়নের বিষয়ে আল্লাহ তায়ালার উপর তাওয়াক্কুল করুন।

সুতরাং সতর্কতা অবলম্বন যদি তাওয়াক্কুল পরিপন্থী হতো তাহলে আল্লাহ বিশেষভাবে তার নবীকে সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দিতেন

না। কেননা পরামর্শের উদ্দেশ্যই হলো, শত্রু থেকে সতর্কতা অবলম্বনের সর্বোত্তম পন্থা সাথীদের থেকে গ্রহণ করা। তদুপরি আল্লাহ তায়ালা সতর্কতা অবলম্বনের ক্ষেত্রে সাথী-সঙ্গীদের মতামত গ্রহণের নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত হননি, বরং নামাজের মতো সর্বোত্তম এবাদতের ক্ষেত্রেও সতর্কতা অবলম্বনকে কার্যত বাস্তবায়নের নির্দেশ দিয়ে বলেছেন,

وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا

أسلحتهم অর্থঃ নবী হে! জিহাদের ময়দানে আপনি যখন নামাজের জামাআত কায়েম করেন, তখন মুজাহিদদের একদল যেন আপনার সাথে দাঁড়ায় এবং তারা যেন সশস্ত্র থাকে। অতঃপর সতর্কতা অবলম্বনের কারণ বর্ণনা করে আল্লাহ তায়ালা বলেন, وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً অর্থঃ কাফিরগণ কামনা করে যে, তোমরা যেন তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র ও আসবাব সম্বন্ধে অসতর্ক হও, যেন তোমাদের উপর একযোগে আক্রমণ করা তাদের জন্য সহজতর হয়।

সুতরাং যে ব্যক্তি এ বিষয়ে অবগত যে, সতর্কতা অবলম্বন তাওয়াক্কুলেরই অংশবিশেষ, সে কিছুতেই এ কথা বলবেনা যে, আল্লাহর প্রতি বান্দার তাওয়াক্কুল তখনই সহীহ হবে যখন সে সতর্কতা অবলম্বন পরিহার করবে। বরং তাওয়াক্কুল হলো, যা বাস্ত বায়নের ক্ষমতা বান্দার নেই সে বিষয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করা। এ কারণেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, اعقلها وتوكل। অর্থঃ আগে উট বাঁধো তারপর তাওয়াক্কুল করো।

যদি সতর্কতা অবলম্বন পরিহারের নাম তাওয়াক্কুল হতো তাহলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানবকে সর্বোত্তম এবাদত নামাজের মধ্যে আল্লাহ সতর্কতা অবলম্বন না করার নির্দেশ দিতেন। কিন্তু মহাপ্রজ্ঞাবান আল্লাহ তা করেন নি, বরং সর্বোত্তম এবাদত নামাজের মধ্যেও সশস্ত্র থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। একারণেই ইমাম শাফেঈ (রহ.) বলেন, যদি হামলার আশঙ্কা থাকে তাহলে নামাজের মধ্যেও সশস্ত্র থাকা ওয়াজিব।

সুতরাং সতর্কতা অবলম্বন তাওয়াক্কুল পরিপন্থী নয়। কেননা মুসা আলাইহিস সালামকে যখন বলা হলো, إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ নেতৃবৃন্দ তোমাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করছে, তিনি তখন শহর ছেড়ে মাদায়েন চলে যান।

আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ষড়যন্ত্রকারীদের থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে মক্কা ছেড়ে মদীনা হিজরত করেন এবং গুহার বিষধর প্রাণীর দংশন থেকে নবীকে রক্ষার উদ্দেশ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) গুহার ছিদ্রপথ কাপড় দ্বারা বন্ধ করেন।

এভাবেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাহাবাগণ সতর্কতা অবলম্বনের পর আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে উম্মতকে তাওয়াক্কুল শিক্ষা দিয়েছেন।

সতর্কতা অবলম্বনের এরূপ বহু উদাহরণ আল্লাহ কোরআনে বর্ণনা করেছেন। ইয়াকুব আলাইহিস সালামের উক্তি উল্লেখ করে আল্লাহ তায়ালা বলেন, لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا অর্থঃ ইউসুফ (আ.) তার পিতা ইয়াকুবের নিকট নিজ স্বপ্ন বর্ণনা করলে

ইয়াকুব আলাইহি সালাম তাকে বললেন, সাবধান; এ স্বপ্ন তোমার ভাইদের নিকট বর্ণনা করোনা, তাহলে তারা তোমাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করবে।

অন্য আয়াতে ইয়াকুব আলাইহিস সালামের উক্তি উল্লেখ করে আল্লাহ তায়ালা বলেন, لاتَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وادخلوا من أبواب متفرقة অর্থঃ ইয়াকুব আলাইহিস সালাম তার সন্তানদেরকে বললেন, তোমরা বাদশাহর দরবারে এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করোনা, বরং ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করো।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, আমরা কিভাবে সতর্কতা অবলম্বন করবো, অথচ সৃষ্টির বহু পূর্বেই মানুষের ভাগ্য লিপিবদ্ধ হয়েছে! আমরা বলবো, আপনি কেনইবা সতর্কতা অবলম্বন করবেন না, অথচ ভাগ্য নির্ধারণকারীই সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন! সুতরাং যিনি ভাগ্য নির্ধারণকারী, সতর্কতা অবলম্বনের আদেশদাতও তিনি। আল্লাহ তায়ালা বলেন, وَخُذُوا حِذْرَكُمْ অর্থঃ তোমরা সতর্কতা অবলম্বন করো।

আবু উছমান বলেন, একদিন ঈছা আলাইহিস সালাম পাহাড়ের চূড়ায় নামাজ পড়ছিলেন। তখন ইবলিস তার নিকট এসে বললো, আপনিতো দাবি করেন যে, সবকিছু আল্লাহর ফায়সালা ও তাক্বদীর অনুযায়ী হয়। তিনি বললেন, হাঁ; অবশ্যই আমি তা দাবি করি। শয়তান বললো, তাহলে আপনি পাহাড় থেকে ঝাপ দিয়ে মনকে বলুন, আল্লাহ আমার জন্য এটাই ফায়সালা করেছেন। তখন ঈসা আলাইহিস সালাম বললেন, হে অভিশপ্ত ইবলিস! পরীক্ষাতো আল্লাহ বান্দাকে করবেন, কিন্তু বান্দার জন্য সমীচীন নয় যে, সে আল্লাহকে পরীক্ষা করবে।

এসব আবেদদেরকে শয়তান ধোঁকা দিয়ে বলে যে, রুজি উপার্জনতো তাওয়াক্কুল পরিপন্থী। আবদুর রহমান সালামী বলেন, আমি মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ রাজিকে বলতে শুনেছি, এক ব্যক্তি আবু আবদুল্লাহ ইবনে সালেমকে জিজ্ঞেস করেন, আমরা আল্লাহর এবাদত করবো কী উপার্জনের ভিত্তিতে না তাওয়াক্কুলের ভিত্তিতে? তিনি উত্তরে বলেন, তাওয়াক্কুল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের হালত, আর উপার্জন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত।

তিনি আরো বলেন, উপার্জনতো ঐ ব্যক্তির জন্য সুন্নাত আল্লাহর প্রতি যার আস্থা মজবুত নয় এবং যে পূর্ণতার ঐ স্তরে উপনিত নয় যে স্তরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপনিত ছিলেন - যেন তাওয়াক্কুলের ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্তরে উপনিত না হতে পারলেও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের উপর আমল যেন তার সম্ভব হয়। তবে আল্লাহর প্রতি যার আস্থা মজবুত উপার্জন তার জন্য অবৈধ।

আবুল কাসেম রাজি বলেন, আমি ইউসুফ বিন হুসাইনকে বলতে শুনেছি, যদি কোন মুরিদ রুজি উপার্জনে ব্যস্ত হয় তাহলে তার থেকে কল্যাণ পাওয়া অসম্ভব।

আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেন, তাওয়াক্কুল সম্পর্কে এমন বক্তব্য যারা পেশ করে তারা তাওয়াক্কুলের অর্থ বুঝেনি। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, তাওয়াক্কুল এমন একটি বিষয় যার সম্পর্ক অন্তরের সাথে; সুতরাং রুজি উপার্জনে দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহার তাওয়াক্কুল পরিপন্থী নয়। যদি রুজি উপার্জনকারীকে মুতাওয়াক্কিল না বলা হয় তাহলেতো কোন নবী মুতাওয়াক্কিল ছিলেন না। কেননা আদম আলাইহিস সালাম চাষী ছিলেন, নূহ ও যাকারিয়া (আ.) কাঠমিস্ত্রী

ছিলেন, ইদ্রিস (আ.) দর্জি ছিলেন, ইবরাহিম ও লুত (আ.) কৃষক ছিলেন, সালেহ (আ.) ব্যবসায়ী ছিলেন, দাউদ (আ.) বর্ম বানাতেন এবং তা বিক্রি করে সংসার চালাতেন, মুসা (আ.) শুআইব (আ.) ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাখাল ছিলেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, كنت أرعى غنما لأهل مكة بالقراريط অর্থঃ আমি অর্থের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের বকরী চড়াতাম।

যখন আল্লাহ তায়ালা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য গনীমতের অংশ নির্ধারণ করেন তখন থেকে তিনি আর উপার্জনের মুখাপেক্ষী হননি।

হজরত আবু বকর, ওসমান, আবদুর রহমান বিন আউফ ও তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহুম; এরা সকলেই বস্ত্র-ব্যবসায়ী ছিলেন। অনুরুপভাবে মুহাম্মদ বিন সীরিন ও মায়মুন বিন মেহরানও (রহ.) বস্ত্র-ব্যবসায়ী ছিলেন।

যোবায়ের ইবনুল আওয়াম, আমর বিন আস ও আমের বিন কুরাইজ (রা.) রেশম-ব্যবসায়ী ছিলেন। অনুরুপভাবে ইমামে আজম আবু হানীফাও (রহ.) রেশম-ব্যবসায়ী ছিলেন।

এভাবে সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈগণ নিজেরা উপার্জন করতেন এবং অন্যকেও উপার্জনের আদেশ করতেন।

আতা বিন সায়েব (রা,) বলেন, যখন খেলাফতের দায়িত্ব আবু বকর সিদ্দীকের ঘাড়ে অর্পিত হয় তখন ব্যবসার উদ্দেশ্যে মাথায় কাপড় নিয়ে তিনি বাজারে রওয়ানা হলে ওমর ও আবু ওবায়দার (রা.) সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। তারা বললেন, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? তিনি

বললেন, আমি বাজারে যাচ্ছি। তারা বললেন, আপনি যদি বাজারে গিয়ে ব্যবসা করেন তাহলে মুসলমানদের দায়িত্ব কে পালন করবে? তিনি বললেন, আমি যদি ব্যবসা না করি তাহলে আমার পরিবারকে কোথা হইতে খাওয়াবো?

আমর বিন মায়মুন (রা.) বলেন, খেলাফতের দায়িত্ব আবু বকর সিদ্দীকের (রা.) ঘাড়ে অর্পিত হলে তার জন্য দুই হাজার দিরহাম নির্ধারণ করা হয়। তিনি তখন বললেন, আমাকে আরো কিছু বাড়িয়ে দাও, কেননা আমার পরিবার আছে, আর তোমরাও আমাকে ব্যবসা থেকে বিরত রেখেছো। তখন তার জন্য পাঁচশত দেরহাম বাড়ানো হয়।

আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেন, যদি কোন ব্যক্তি সুফিদেরকে বলে, আমি কোথা হইতে আমার পরিবারকে খাওয়াবো? তাহলে অবশ্যই তারা বলবে যে, তুমি শিরক করেছো। আর তাদেরকে যদি এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় যে ব্যবসা করে, তাহলে অবশ্যই তারা বলবে, সে আল্লাহর উপর ভরসাকারী নয় এবং আল্লাহর প্রতি তার একিন সহীহ নয়। এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, তাওয়াক্কুল ও একিনের অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞতাই তাদেরকে এরূপ বলতে উদ্বুদ্ধ করে।

কতক সুফিদের অবস্থা এমন, যারা আয়-উপার্জন বাদ দিয়ে মিছকিনের ন্যায় সর্বদা খানকায় পড়ে থাকে। আর এ বিষয়টিতো সর্বজন বিদিত যে, খানকাসমূহ মানুষের দান-অনুদান থেকে মুক্ত নয়, যেভাবে দোকানসমূহ ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্য থেকে মুক্ত নয়। এসব সুফিদের জীবিকা নির্বাহের একমাত্র উৎস হয় মানুষের দান-অনুদান এবং মানুষের দান-অনুদানই তাদের ভরসার একমাত্র কেন্দ্রবিন্দু। অথচ আমাদের পূর্বসূরি ওলামা ও সাহাবাগণ উপার্জন ব্যতিরেকে

এভাবে খানকা ও মসজিদে পড়ে থাকার বিষয়ে নিন্দা জ্ঞাপন করেছেন।

ইবরাহিম বিন আদহাম বলেন, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব বলতেন, من لزم المسجد وترك الحرفة وقبل ما يأتيه فقد ألحف في السؤال অর্থঃ যে ব্যক্তি উপার্জন ব্যতিরেকে সর্বদা মসজিদে পড়ে থাকে এবং মানুষের দান-অনুদান আসলে তা গ্রহণ করে সেতো ভিক্ষার জন্য মিনতি করলো।

ইসমাঈল বিন নাজদী বলেন, আবু তুরাব তার সাথীদের বলতেন, তোমাদের যে ব্যক্তি তালিযুক্ত কাপড় পরিধান করবে সে যেন ভিক্ষার ভান করলো, আর যে উপার্জন ব্যতিরেকে তার খানকা অথবা মসজিদে পড়ে থাকবে সেও ভিক্ষার ভান করলো।

আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেন, আমাদের পূর্বসূরীরা এসব রীতি-নীতি অবলম্বনের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে রুজি উপার্জনের নির্দেশ দিতেন।

ওমর বিন খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, يا معشر الفقراء أرفعوا رؤسكم فقد وضح الطريق فاستبقوا الخيرات ولا تكونوا عيالا على المسلمين. অর্থঃ হে দরিদ্র সম্প্রদায়, তোমরা মাথা উঁচু করো, নিশ্চয় হক-বাতিলের পথ স্পষ্ট হয়েছে, সুতরাং কল্যাণের দিকে ধাবিত হও এবং মুসলমানদের উপর নির্ভরশীল হয়োনা।

মুহাম্মদ বিন আসেম বলেন, আমার নিকট এ সংবাদ পৌঁছলো যে, কোন বালককে দেখে ওমর বিন খাত্তাব মুগ্ধ হলে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে বলতেন, তার কি কোন পেশা আছে? নেতিবাচক উত্তর

দেয়া হলে তিনি বলতেন, সে আমার দৃষ্টি হতে পড়ে গেলো।

সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবারা শামে ব্যবসা করতেন, তালহা বিন ওবায়দুল্লাহ এবং সাঈদ বিন যায়েদ (রা.) ছিলেন তাদের অন্যতম।

আবুল কাসেম বিন খুত্তালী বলেন, আমি আহমদ বিন হামবলকে বললাম, আপনি এমন ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলেন, যে সর্বদা ঘরে কিংবা মসজিদে অবস্থান করে বলে, আমি ততক্ষণ কোন কাজ করবোনা যতক্ষণনা আমার রিজিক আমার নিকট উপস্থিত হয়। তখন আহমদ বিন হামবল বললেন, এতো এমন অজ্ঞ ব্যক্তি শরীয়ত সম্পর্কে যার কোন জ্ঞান নেই। তুমি কী শুনোনি যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, جعل الله رزقي تحت ظل رمحي আল্লাহ তায়ালা আমার তরবারীর ছায়ার নিচে আমার রিযিক নির্ধারণ করেছেন।

অন্য হাদীসে এসেছে, পাখিরা ভোরবেলা শূন্যোদর নিয়ে রিযিক অন্বেষণে বের হয়।

এক আয়াতে আল্লাহ বলেন, لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ অর্থঃ আল্লাহর রিযিক অন্বেষণে তোমাদের কোন গুনাহ নেই।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবারা জলে-স্থলে ব্যবসা করতেন এবং নিজেদের খেজুর বাগানে কাজ করতেন, সুতরাং তাদের মাঝে রয়েছে আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ।

আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, এক ব্যক্তি ইমাম আহমদ বিন হামবলকে বললো, আমি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলের ভিত্তিতে হজ্জ করতে চাই। তখন আহমদ বিন হামবল তাকে বললেন, তাহলে

কাফেলায় শরীক হওয়া ব্যতীত হজ্জের উদ্দেশ্যে সফর করো। লোকটি তখন বললো, এটাতো আমার পক্ষে অসম্ভব। তখন আহমদ বিন হাম্বল বললেন, তাহলে তোমার তাওয়াক্কুলতো মানুষের পেটিলার উপর–আল্লাহর উপর নয়।

আবু বকর মারুযী বলেন, আমি আবু আবদুল্লাহকে বললাম, তাওয়াক্কুলের দাবিদার এসব লোকেরা বলে যে, আমরা রিযিক অন্বেষণ করবোনা, কেননা আমাদের রিযিক আল্লাহর জিম্মায়। তিনি তখন বললেন, এতো এক নিকৃষ্ট কথা, যা নির্বোধ লোকদের থেকেই প্রকাশ পেয়ে থাকে। আল্লাহ তায়ালা কি বলেননি যে, إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ অর্থঃ জুমআর দিন যখন নামাজের আযান দেয় তখন কেনা-বেচা বন্ধ করে নামাজের দিকে ধাবিত হও।

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ বলেন, فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله অর্থঃ যখন নামাজ সমাপ্ত হয় তখন যমিনে ছড়িয়ে পরো এবং (ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে) আল্লাহর রিজিক অন্বেষণ করো।

আবদুল্লাহ বিন আহমদ বলেন, আমি আমার বাবাকে এমন সম্প্রদায়ের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম, যারা বলে যে, আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করবো কিন্তু উপার্জন করবোনা। তিনি তখন বললেন, এতো এমন উক্তি যা আহমক থেকেই প্রকাশ পায়। বরং প্রত্যেক মানুষের উচিত আল্লাহর উপর ভরসা করে রুজি উপার্জনে সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করা।

মুহাম্মদ বিন আলী বলেন, সালেহ তার বাবা আহমদ বিন হামবলকে তাওয়াক্কুল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে বলেন, তাওয়াক্কুল কতইনা উত্তম, কিন্তু মানুষের উচিত কাজ-কর্ম এবং উপার্জন দ্বারা নিজেকে এবং পরিবার-পরিজনকে সচ্ছল রাখা, এবং কোন অবস্থাতেই কর্ম হতে বিরত না থাকা।

সালেহ আরো বলেন, আমার উপস্থিতিতে আমার বাবা আহমদ বিন হামবলকে এমন সম্প্রদায়ের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলো, যারা কাজে লিপ্ত না হয়ে বলে যে, আমরা আল্লাহর উপর ভরসাকারী। তিনি তখন বললেন, এরা ভরসাকারী নয় বরং এরা হলো বিদআতী।

আহমদ বিন হামবল আরো বলেন, এরা এমন নিকৃষ্ট সম্প্রদায় যারা চায় দুনিয়ার নেয়াম বিপর্যস্ত করতে।

মারুযী বলেন, আমি আহমদ বিন হামবলকে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, যে উপার্জন ছেড়ে দিয়ে বলে যে, আমি ধৈর্য ধারণ করে ঘরে বসে থাকবো এবং কাউকে আমার বিষয়ে অবগত করবোনা। তখন আহমদ বিন হামবল বললেন, যদি সে ঘর থেকে বের হয়ে রুজি উপার্জনে লিপ্ত হতো তাহলে তা হতো আমার নিকট অধিক পসন্দনীয়। কেননা সে যদি উপার্জনে লিপ্ত না হয়ে ঘরে বসে থাকে তাহলে আমার আশঙ্কা হয় যে, তাকে তার বসে থাকা অন্য দিকে ধাবিত করবে। আমি বললাম, তার বসে থাকা তাকে কোন দিকে ধাবিত করবে? তিনি বললেন, ক্রমান্বয়ে সে মানুষ থেকে এ প্রত্যাশা করবে যে, তারা যেন তার নিকট হাদিয়া-উপঢৌকন প্রেরণ করে। আবু বকর মারুযী বলেন, আমার উপস্থিতিতে এক ব্যক্তি ইমাম আহমদ বিন হামবলকে (রহ.) বললো, আমারতো জীবন ধারণের মতো যথেষ্ট পরিমাণ মাল রয়েছে। তখন আহমদ বিন হামবল তাকে

বললেন, তুমি বাজারে গিয়ে ব্যবসা করো এবং উপার্জিত সম্পদ দ্বারা পরিবারের সেবা করো এবং আত্মীয়তার বন্ধন মজবুত করো।

তিনি অন্যএক ব্যক্তিকে বলেন, তুমি কাজে লিপ্ত হও এবং প্রয়োজনাধিক সম্পদ আত্মীয়-স্বজনের উপর সদকা করো।

আহমদ বিন হামবল (রহ.) বলেন, আমি আমার সন্তানদিগকে বাজারে গিয়ে ব্যবসা করার নির্দেশ দিয়েছি।

ফজল বিন মুহাম্মদ বিন যিয়াদ বলেন, ইমাম আহমদ বিন হামবল (রহ.) মানুষকে বাজারে গিয়ে ব্যবসা করার নির্দেশ দিয়ে বলতেন, বাজারে গিয়ে ব্যবসা করা মানুষ থেকে অমুখাপেক্ষী থাকার কতইনা উত্তম পন্থা।

আবু বকর বিন জানাদ বলেন, আমি আহমদ বিন হামবলকে বলতে শুনেছি, ব্যবসার মাধ্যমে অর্জিত দিরহাম আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়, আর যে দিরহাম সাথী-সঙ্গী ও বন্ধু-বান্ধবের পক্ষ হতে অনুদান ও উপঢৌকন স্বরূপ আসে তা আমার নিকট সর্বাধিক ঘৃণিত।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.)বলেন, ইবরাহিম বিন আদহাম (রহ.) ফসল কাটতেন, সালমান খাওয়াছ (রহ.) টোকাই ছিলেন এবং হুজাইফা মারআসি (রহ.) গোয়াল ছিলেন।

ইবনে আক্বীল (রহ.) বলেন, আসবাব গ্রহণ তাওয়াক্কুল পরিপন্থী নয় এবং আসবাব গ্রহণকারীকে নিন্দার কোন সুযোগ ইসলামে নেই। এ বিষয়টি ভালোভাবে জেনে রাখুন যে, নবীদের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট হতে উঁচু স্তরের গুণাবলী ও বৈশিষ্টের অনুশীলন যেভাবে শরীয়ত বিরোধী তদ্রুপ তা দীনের জন্য ক্ষতিকরও বটে।

যখন মুসা আলাইহিস সালামকে বলা হলো যে, إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ

إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ সভাষদবর্গতো আপনাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করছে, তখন তিনি শহর ছেড়ে মাদায়েন চলে যান। যখন ক্ষুধার্ত হন এবং চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষার্থে বিবাহের প্রয়োজন অনুভব করেন তখন আট বছর অন্যের অধীনে কাজ করেন।

এক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه অর্থঃ তোমরা যমীনের বিভিন্ন স্থানে বিচরণ করে আমার রিজিক ভক্ষণ করো। উক্ত আয়াতে আল্লাহ তার বান্দাকে শক্তি ব্যয়ের মাধ্যমে রিজিক অন্বেষণের নির্দেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ আয়াতের ভাবার্থ যেন এমন, প্রথমে তোমার নিকট শক্তি নামক যে নেয়ামত রয়েছে তা ব্যয় করো অতঃপর আল্লাহর নিকট যে রিজিক রয়েছে তা প্রার্থনা করো।

আবার কতক সম্প্রদায়ের অবস্থা এমন, যারা অলসতার দরুন রুজি উপার্জন থেকে বিরত থাকে। ফলে তারা জঘন্যতম দু'টি বিষয়ের সম্মুখীন হয়ঃ- তারা হয় পরিবারের ক্ষতি সাধন করে, ফলে তারা বর্জন করে তাদের উপর আবশ্যকীয় বিবিধ ফরযসমূহ, অথবা তারা ভূষিত হয় 'মুতাওয়াক্কিল' নামক পদবিতে। ফলে উপার্জনকারীরা তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে তাদের সম্পদ থেকে তাদেরকে দান করে নিজেদের পরিবারকে সঙ্কটে ফেলে। মানুষের দান-অনুদানের প্রতি আত্মনির্ভরতার এমন নিকৃষ্ট সভাব তার মাঝেই পাওয়া যায় যে মনের দিক থেকে নিচু ও নিকৃষ্ট মনোভাবের অধিকারী।

রুজি উপার্জনে নির্লিপ্ত এসব ব্যক্তিরা উপার্জনে লিপ্ত না হওয়ার বিভিন্ন নিকৃষ্ট কারণ দর্শিয়ে থাকে।

প্রথমতঃ তারা বলে যে, আমাদের রিজিক আমাদের নিকট পৌঁছার বিষয়টি অবধারিত। তাদের এ কথা নিন্দার দিক থেকে সর্বাধিক

জঘন্যতম। কেননা মানুষ যদি আল্লাহর আনুগত্য ছেড়ে দিয়ে বলে যে, আমি আমার আনুগত্য দ্বারা যে ফায়সালা আল্লাহ আমার জন্য করেছেন তা পরিবর্তন করতে সক্ষম নই। আমি যদি জান্নাতের অধিবাসী হই তাহলে মৃত্যুর পর জান্নাতে প্রবেশ করবো, আর যদি জাহান্নামের অধিবাসী হই তাহলে মৃত্যুর পর জাহান্নামে প্রবেশ করবো। আমরা তাদেরকে বলবো, আপনাদের এ কথা আল্লাহর সকল আদেশকে প্রত্যাখ্যান করে। যদি কারো ক্ষেত্রে এ কথা প্রযোজ্য হতো তাহলে আদম আলাইহিস সালাম কখনোই জান্নাত হতে বের হতেননা। কেননা আদমতো (আ.) এ কথা বলতেন যে, আমি যা করেছি তা আল্লাহ তায়ালাই আমার জন্য ফায়সালা করেছেন। আর এ বিষয়টিতো সর্বজন বিদিত যে, আমরা আল্লাহর আদেশের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবো–তাকদীরের বিষয়ে নয়।

দ্বিতীয়তঃ তারা বলে যে, দুনিয়াতে হালাল মাল কোথায়, যা আমরা উপার্জন করতে পারি? এতো এমন কথা যা মূর্খ লোক থেকেই প্রকাশ পায়। কেননা হালাল মাল অফুরন্ত, যা কেয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'الحلال بين والحرام بين' অর্থঃ হালাল-হারামের বিষয়টি সুস্পষ্ট। আর এ বিষয়টিতো সর্বজন বিদিত যে, হালাল ঐ বস্তুকে বলে, যা গ্রহণের অনুমতি শরীয়ত প্রদান করেছে। তাদের এ কথা তাদের অলসতার ব্যাপারে সুস্পষ্ট দলীল।

তৃতীয়তঃ তারা বলে যে, আমরা যদি উপার্জন করি তাহলে তা হবে জালেম ও পাপীদেরকে সাহায্য করার শামিল।

আলী বিন মুহাম্মদ সাইরাওয়ানী বলেন, আমি ইবরাহিম খাওয়াছকে বলতে শুনেছি, আমি সকল বস্তুর মাঝে হালাল রিজিক অন্বেষণ

করেছি। একবার আমি হালাল রিজিক অন্বেষণের উদ্দেশ্যে বড়শি হাতে মাছ শিকারে বের হলাম। জলাশয়ের পাড়ে বসে বড়শি নিক্ষেপ করলে একটি মাছ বড়শিতে ধরা পরে। আমি মাছটি যমীনে রেখে দ্বিতীয়বার বড়শি নিক্ষেপ করলে পুনরায় একটি মাছ বড়শিতে ধরা পরে। আমি মাছটি যমীনে রেখে তৃতীয়বার বড়শি নিক্ষেপ করবো, এমন সময় কে যেন আমার পিঠে চড় মারলো। কার হাত থেকে এ চড় এসেছে আমি তা জানিনা এবং কেউ আমার দৃষ্টি গোচরও হলোনা। তখন অদৃশ্য হতে আওয়াজ দিয়ে কেউ আমাকে বললো, তুমিতো এমন প্রাণী হত্যার মাঝে রিজিক অন্বেষণ করছো যে আমার যিকির করে। তিনি বলেন, এ কথা শ্রবণে আমি বড়শির সুতা ছিড়ে ফেলি এবং বড়শির ছিপ ভেঙ্গে ফেলি, অতঃপর তথা হইতে প্রস্থান করি।

আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেন, এ ঘটনা যদি সত্য হয় তবুও আমরা বলবো, ঘটনাটি বর্ণনাকারীদের মাঝে এমন রাবীও আছে যে মিথ্যায় অভিযুক্ত। কেননা অদৃশ্য হতে যে চড় মেরেছে সে ইবলিস, আর সেই অদৃশ্য হতে কথা বলেছে। কেননা আল্লাহ তায়ালা প্রাণী শিকার বৈধ করেছেন। সুতরাং তিনি যে বিষয় বৈধ করেছেন তা গ্রহণকারীকে তিনি শাস্তি প্রদান করবেন–এটাতো অসম্ভব বিষয়। আর তিনি কিভাবে তাকে বলবেন যে, তুমিতো এমন প্রাণী হত্যার মাঝে রিজিক অন্বেষণ করছো যে আমার যিকির করে–অথচ তাঁকে হত্যা করা তিনিই বৈধ করেছেন! আর হালাল রিজিক উপার্জনতো শরীয়তে প্রশংসিত–নিন্দিত নয়। আর আল্লাহর যিকির করে বিধায় আমরা যদি প্রাণি শিকার এবং তা জবেহ করা বর্জন করি তাহলেতো আমরা এমন বস্তু পাবোনা যা মানুষের দেহকে সবল রাখবে। কেননা মাছ-গোস্তই একমাত্র খাদ্য যা মানুষের দেহকে সবল রাখে। আর মাছ শিকার ও প্রাণী জবেহ থেকে

বিরত থাকাতো বারাহিমাদের মাযহাব। সুতরাং লক্ষ করুন, শরীয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে অজ্ঞতা অজ্ঞ ব্যক্তির সাথে কিরুপ আচরণ করে, আর ইবলিছ তাদের নিয়ে কেমন তামাসা করে।

আবদুল্লাহ বিন আবদুল মালিক বলেন, আমি আবু তুরাব নামে জনৈক শায়খকে বলতে শুনেছি, একবার ফতেহ মাওসিলীকে বলা হলো, আপনিতো বড়শি দ্বারা মাছ শিকার করে তা শুধু আপনার পরিবারকেই খাওয়ান, বাজারে গিয়ে মানুষের নিকটতো কখনো তা বিক্রি করেন না! তখন তিনি বললেন, মানুষের নিকট তা বিক্রি করলে আমার আশঙ্কা হয় যে, পানিতে বিচরণকারী আল্লাহর আনুগত্যশীল প্রাণীকে যমীনে বিচরণকারী আল্লাহর নাফরমানকে আমি তা খাওয়াবো।

আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেন, ফতেহ মাওসিলী থেকে এ বর্ণনা যদি সঠিকও হয় তাহলে তা হবে বাজারে মাছ বিক্রি না করার দুর্বল অজুহাত, যা শরীয়ত ও আকল বিরোধী। কেননা আল্লাহ তায়ালা উপার্জনকে বৈধ করেছেন এবং তার প্রশংসা করেছেন।

যদি কেউ বলে, আমার তৈয়ারকৃত রুটিতো অনেক সময় আল্লাহর পাপী বান্দাও ভক্ষণ করে, তাহলে তা হবে এক অর্থহীন কথা। কেননা পাপী বান্দা রুটি ভক্ষণ করবে এ আশঙ্কায় যদি রুটি বিক্রি জায়েজ না হয় তাহলেতো ইহুদী-নাসারাদের নিকট রুটি বিক্রয় আমাদের জন্য বৈধ হবেনা।

পোষাকের ক্ষেত্রে সুফিদেরকে শয়তানের ধোঁকাদানের বিবরণ

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, প্রথম যুগের সুফিরা যখন শুনলো যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার

কাপড়ে তালি যুক্ত করতেন এবং আয়েশাকে (রা.) বলেছেন, কাপড়ে তালিযুক্ত করার পূর্বে তা পরিধান থেকে বিরত হয়োনা। আর তারা একথাও শুনলো যে, ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাপড় তালিযুক্ত ছিলো এবং ওয়ায়েছ করনী ময়লা ফেলার স্থান থেকে কাপড়ের টুকরা কুড়িয়ে তা ফোরাত নদীতে ধৌত করতেন, অতঃপর তা দ্বারা কাপড় তালিযুক্ত করে সে কাপড় পরিধান করতেন। তাই এসব সুফিরাও ভুল ক্বিয়াসের বশীভূত হয়ে নিজেদের জন্য তালিযুক্ত কাপড় নির্বাচন করে। অথচ তাদের জানা নেই যে, তারা হাদীসের মর্ম উপলব্ধি করতে অক্ষম হয়েছেন। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাহাবাগণ জরাজীর্ণ অবস্থাকে প্রাধান্য দিতেন এবং দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত হেতু দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে নির্লিপ্ত হতেন, আর তাদের অধিকাংশই দারিদ্রতার কারণে তালিযুক্ত কাপড় পরিধান করতেন।

যেমনঃ- মাসলামা বিন আবদুল মালিক বলেন, আমি একদিন ওমর বিন আবদুল আজীজের গৃহে প্রবেশ করে তাকে ময়লা কাপড় পরিহিত অবস্থায় দেখতে পেয়ে তার স্ত্রী ফাতেমাকে বললাম, আমীরুল মুমিনীনের জামাটি ধুয়ে দাও। তখন ফাতেমা বললো, আল্লাহর কসম; এ জামা ছাড়া তার অন্য কোন জামা নেই।

সুতরাং জরাজীর্ণ অবস্থা যার পসন্দ নয় এবং আর্থিক অবস্থাও যার দুর্বল নয়, তার জন্য তালিযুক্ত কাপড় পরিধানের কী অর্থ!

আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেন, এতো প্রথম যুগের সুফিদের অবস্থা। পক্ষান্তরে এ যুগের সুফিদের অবস্থা হলো, তারা বিভিন্ন রঙয়ের দু'/তিনটি কাপড় ক্রয় করে সেগুলোর বিভিন্ন স্থানে ফুটা করে তাতে তালিযুক্ত করেন। ফলে তাদের এ কাপড় দু'টি বৈশিষ্ট ধারণ করেঃ-

প্রথমতঃ প্রসিদ্ধি আর দ্বিতীয়তঃ প্রবৃত্তির অনুসরণ। কেননা এ ধরনের তালিযুক্ত কাপড় বহু লোকের নিকট রেশমী কাপড় থেকেও অধিক প্রিয়। এসব কাপড় পরিহিত ব্যক্তি মানুষের নিকট জাহেদ হিসাবে পরিচিত হয়।

আচ্ছা বলুনতো, এরা কী শুধু তালিযুক্ত কাপড় পরিধান করেই পূর্বসূরিদের মতো হয়ে যাবে? অথচ তারা এমনটিই ধারণা করে। আর ইবলিসও তাদের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল করে যে, তোমরাতো সুফি। কেননা সুফিদের বৈশিষ্ট হলো, তারা তালিযুক্ত কাপড় পরিধান করবে, আর তোমরাতো তালিযুক্ত কাপড়ই পরিধান করছো।

আচ্ছা আপনার কী মনে হয় যে, একটি বিশেষ গুণের নাম তাসাওউফ, কোন বাহ্যিক অবস্থার নাম নয় - এ বিষয়টি তাদের জানা নেই?

প্রথম যুগের সুফিদের সাথে এদের না আছে বাহ্যিক মিল না আছে গুণগত মিল। বাহ্যিক অমিলের কারণ হলো, প্রথম যুগের সুফিরা প্রয়োজনের তাগিদে তালিযুক্ত কাপড় পরিধান করতেন। তাদের যেভাবে তালিযুক্ত দ্বারা শোভাবর্ধণ উদ্দেশ্য ছিলোনা, তদ্রুপ বিভিন্ন রঙয়ের কয়েকটি নতুন কাপড় সংগ্রহ করে তার কয়েক স্থানে ফুটা করে তাতে চিত্তাকর্ষক তালিও তারা লাগাতেন না।

হযরত ওমরের ঘটনাতো এমন, তিনি বাইতুল মুকাদ্দাস গমন করলে তথাকার খৃষ্টান পুরোহিতরা জিজ্ঞেস করলো, তোমাদের আমীর কে? তখন সাহাবায়ে কেরাম সেনাদলের আমীর আবু ওবায়দা, খালেদ বিন ওয়ালিদ ও অন্যান্যদেরকে তাদের সামনে পেশ করলে তারা বললো, আমাদের নিকট আমীরের যে বৈশিষ্ট বর্ণিত হয়েছে এরাতো সেই ব্যক্তি নয়। তারা বললো, তোমাদের কী আমীর আছেন নাকি নেই?

সাহাবারা বললেন, এরা ছাড়াও আমাদের একজন আমীর আছেন। তারা বললো, উনি কী এসব আমীরদেরও আমীর? সাহাবার বললেন হাঁ, উনি ওমর বিন খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু। তারা বললো, তোমরা তাকে আসতে বলো, আমরা তাকে দেখবো। যদি তিনি আমাদের নিকট বর্ণিত গুণের অধিকারী ব্যক্তি হন তাহলে বিনা যুদ্ধে আমরা বাইতুল মুকাদ্দাস তোমাদের নিকট হস্তান্তর করবো। আর যদি তিনি উক্ত গুণের অধিকারী না হন তাহলে আমরা তোমাদের নিকট তা হস্ত ান্তর করবোনা। আর তোমরা যদি আমাদেরকে অবরুদ্ধ করো তাহলে কিছুতেই আমাদের সাথে পারবেনা।

তখন মুসলমানরা ওমর বিন খাত্তাবের নিকট লোক পাঠিয়ে তাকে বিষয়টি অবহিত করলে তিনি তাদের সামনে উপস্থিত হন। তখন যে কাপড়টি তার পরনে ছিলো তাতে সতেরটি তালি ছিলো, যার একটি ছিলো চামড়ার। খৃষ্টান পুরোহিতরা যখন তাদের কাছে বর্ণিত গুণাবলি ওমর বিন খাত্তাবের মাঝে দেখতে পেলো তখন বিনা যুদ্ধে বাইতুল মুকাদ্দাস তার কাছে হস্তান্তর করলো। হায় আফসোস: এ যুগের মূর্খ সুফিদের মাঝে এসব গুণাবলি কোথায়!

এতো বাহ্যিক অমিলের বর্ণনা, আর গুণগত অমিল হচ্ছে, পূর্ব যুগের সুফিরা ছিলেন এবাদতে কঠোর পরিশ্রমী ও দুনিয়ার বিষয়ে পূর্ণ বৈরাগী। পক্ষান্তরে যারা এ যুগের সুফি কষ্ট-মোজাহাদায় শয়তান তাদের মাঝে অনিহাভাব সৃষ্টি করেছে এবং অধিক ভোজন ও আয়েশী জীবনে সে তাদেরকে মুগ্ধ করেছে।

ইবলিস এদেরকে ধারণা দিয়ে বলে, তোমরাইতো শ্রেষ্ঠ সুফি। অথচ লেবাসধারী এসব সুফিদের উদ্দেশ্য হলো, বাহ্যিক বেশ-ভুষায় সুফিদের রীতি-নীতি গ্রহণ করা, আর বাস্তবিকপক্ষে দুনিয়ার

ভোগবিলাসে লিপ্ত হওয়া। তাদের উদ্দেশ্যের নিদর্শন হলো, অহঙ্কার প্রদর্শন ও বড়ত্ব প্রকাশের উদ্দেশ্যে আমীর-ওমারাদের সাথে সাক্ষাৎ করা এবং গরীব-দুঃখীদের থেকে পৃথক থাকা। অথচ হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম বলতেন, হে বনী ইসরাঈল! তোমাদের কী হলো, তোমাদের গায়ে ঝুলছে বৈরাগীদের পোষাক অথচ তোমাদের মাঝে বিরাজ করছে হিংস্র বাঘের অন্তর। তোমাদের উচিত রাজা-বাদশাহদের পোষাক পরিধান করা এবং আল্লাহর ভয় দ্বারা অন্তর নরম করা।